প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগদাদের বাক্স —সত্যজিৎ রায়।

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সৌরভ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

নবম বর্ষ—একাদশ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৭৬/মার্চ ১৯৭০

খুকুর দোকান

দুর্গাদাস সরকার

বাজার কে যান ? একটু দাঁড়ান—হেথায় বসে খুকুর দোকান ;
কম খরচে পয়সা বাঁচান, কিনুন পুতুল, মাছ, মোয়া, পান।
সবই পাবেন এখান থেকে, দেখুন চোখে, কিনুন চেখে ;
পাল্লা দিয়ে বেচছে খুকু, ফাউ দিতে আর পারবে সে কে ?
বাজারে কি সবই মেলে ? আটা-চিনি-চাল রেশনে
কিনতে হলে 'কিউ' দিতে হয় ছোট-বড় সকল জনে।
এই দোকানে কেনেন যদি—লাইন-টাইন দেওয়া মানা,
হাত বাড়ালেই এক নিমেষে সব জিনিসের পাই নিশানা।
খুকুর দোকান ছোট্ট দোকান ? মস্ত মনের ওজন দরে
কাক-চিলেরা পৌঁছে দেবে এক কথাতে ঘরে ঘরে।
মাঘের মেলা, রথের মেলা, পূজোর মেলার অনেক দ্রব্য
যা মেলেনি সস্তা দরে এখানে তা সহজলভ্য।
ভারী জিনিস ছোট জিনিস গানে ভরা সা রে গা মা,
সবই পাবেন এই দোকানে, পাবেন গোটা চাঁদা মামা।
চরকা বুড়ি ঝুড়ি ঝুড়ি খেলনা দিয়ে খুকুর দোকান
সাজিয়ে রাখেন। ভালোবেসে এলেই পাবেন,—যা খুশি চান ॥

(পনেরজন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে টণ্টামোরার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে আসতে গিয়ে ব্রাণ্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার মধ্যে প্রবল ঝড়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সাময়িকভাবে সমস্ত আনন্দ উৎসব স্থগিত রাখা হল। পাহাড়ের কোলে তিনিকা গ্রাম থেকে, হেডমাস্টার আরডনের নির্দেশে মিডি, কিকু ও হকোর নেতৃত্বে তিনটি উদ্ধারকারী দল তিনদিক দিয়ে অনুসন্ধান সুরু করল।

কিন্তু মাজিনকোর গভীর জঙ্গল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তার উপরে আবার সেখানে শয়তান গ্রাটেনকোর উৎপাত।

ওদিকে, তিনজন গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা নিজেদের সামলে নিয়ে উদ্ধারকারী দলের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু স্টেনগান হাতে গ্রাটেনকো তাদের বন্দী করে ফেলল। প্যারাসুটে নামিয়ে দেওয়া রেডিও-যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধারকারীরা এই খবর পেল।

গ্রাটেনকোর গুহায় ছেলেমেয়েরা বন্দী। গুহার এক কোণে গ্রাটেনকো ডাকাতের একটা বাক্সে তার মরা মেয়ের জামা সযত্নে রাখা দেখল এরা কজন।)

॥ ৫ ॥

ওরা বার হয়ে আসতেই টমের সাথে দেখা।

—কোথায় ছিলে তোমরা এতক্ষণ? কি যে ভাবনা হয়েছিল!

—গ্রাটেনকো জানতে পেরেছে নাকি? জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না। সে কোথায়? প্লেনের আওয়াজ শুনেই ছুটেছে বাইরে জিনিস কুড়াতে, এখুনি ফিরবে।

—বিলি আর হামিদুলকে দেখছিনা যে?

—সঙ্গে নিয়ে গেছে মাল বয়ে আনতে।

—রেডিও চালিয়েছো? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না—অত বোকা নয় গ্রাটেনকো। সে যন্ত্র ও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

—বিলি আর হামিদুল কি পালাবার পথ চিনতে পারবে?

—বলে দিয়েছি পথের সব কিছু যেন খুঁটিয়ে দেখে আসে ওরা তা পারবে বলেই আমি ওদের যাওয়াতে আপত্তি করিনি। বলল টম।

—আমরা গ্রাটেনকোর গোপন ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছি।

—কোথায়? বন্দুক-গুলি-বারুদ কিছু আছে?

—না নেই। শুধু জামাকাপড় আর অন্য জিনিস।

—আমাদের কি তা কাজে লাগবে?

—না, ওসব আমরা ছোঁব না।

—ছোঁব না! বেশ! তাহলে আমরা যে ওর গোপন ভাণ্ডারের কথা জেনেছি সেকথা যেন ও জানতে না পারে।

সবাই মাথা নাড়ল এক সাথে। শকুন্তলা নিজে থেকেই রাজি হল ও সুড়ঙ্গে বাচ্চারা যাতে কেউ না ঢোকে সে দিকে খেয়াল রাখার।

প্রায় এক ঘণ্টা বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে বিরাট বোঝা বয়ে নিয়ে ফিরল গ্রাটেনকো। সে বোঝা নাবিয়ে দিয়েই বার হয়ে গেল তখুনি। ফিরল কিছু পরে অন্য বোঝা নিয়ে। সঙ্গে হামিদুল আর বিলি। ওরা দুজনে তখন এমন বেদম হয়ে গেছে যে কোন মতে গুহায় ঢুকেই হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল একটা কম্বলের উপরে। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে ওরা। সে দিকে তাকিয়ে প্রাণ খুলে হেসে উঠল গ্রাটেনকো। তারপর দেওয়ালের একপাশ ঘেঁসে বসে পড়ে নিজেও হাঁপাতে লাগল।

মুংলি তার দলবল নিয়ে গেল মালগুলো খুলতে। প্রচুর খাবারের সাথে আরও অন্য অনেক কিছু পাঠিয়েছে ওরা। সে দিকে তাকিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল টম। চুপিচুপি বলল—এ বোঝা বয়ে এনে খুশি হবেনা বিলি। একটাও বন্দুক নেই এতে। বেচারা!

সবাইকে খাবার ভাগ করে দিল মুংলি। ভীষণ খিদে পেয়েছিল সবারই। সবার থেকে বেশী খেল কিন্তু গ্রাটেনকো। ওর খাওয়া দেখে ভয় পেল রাণা। লোকটা না শেষ পর্যন্ত অসুখে পড়ে। তৈরি খাবার পেয়ে গ্রাটেনকো কিন্তু খুব খুশি—বলল।

—বাঃ এতো বেশ ভালই হল আমার। রোজ রোজ তৈরি খাবার খাওয়া যাবে!

খাওয়া শেষ করে মুংলি গেল আমিনার কাছে। ওর আঘাতগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে নতুন করে আবার ওষুধ লাগিয়ে দিল।

—কেমন আছ তুমি এখন? জিজ্ঞাসা করল ও।

—ভাল। করুণ ভাবে বলল আমিনা। আমি বাড়ি যাব ডাক্তার দিদি!

—হ্যাঁ যাবে নিশ্চয়ই। সাহস দিয়ে বলল মুংলি।—আমরা সকলে বাড়ি যাব।

—কবে?

—দু এক দিনের মধ্যেই।

এক পাশে শুয়েছিল তনুক্কা—সেও বলল—

—দু এক দিনের মধ্যেই সব লোকজন এসে যাবে। তখন আমরা সবাই যাব বাড়িতে।

—কিসের এত কথা হচ্ছে তোদের? হঠাৎ গ্রাটেনকো ওদের কথার মাঝখানে জিজ্ঞাসা করল।

—আমিনা বাড়ি যেতে চাচ্ছে। বলল তমুক্কা।

—বাড়ি!! —হা হা করে হেসে উঠল গ্রাটেনকো।

—কেন তোর এ জায়গাটা ভাল লাগছে না? ভয়ে ভয়ে আমিনা বলল—না। বিচ্ছিরি এ জায়গাটা। আমার একটুও ভাল লাগছে না।

—কিন্তু কি করে বাড়ি যাবি তুই! ওরা যে তোদের সবার কথা ভুলে গেছে।

—তুমি আমাকে বাড়ি দিয়ে আসবে। —থাকতে না পেরে আমিনা বলল।

—আমি দিয়ে আসবো! হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল গ্রাটেনকো। কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ তারপর বলল—আমি যে ডাকাত। আমি কাউকে তো বাড়িতে দিয়ে আসতে পারবো না। বাড়ি যাওয়া হবে না।

একথা শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আমিনা। কান্না জড়ানো গলায় বলল—তুমি কেন আমাদের এমন করে ধরে রেখেছ? আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা সবাই বাড়ি যাব। মার কাছে যাবো। সমস্ত মুখের চেহারা বদলে গেল গ্রাটেনকোর। লাফিয়ে উঠে হঠাৎ শূন্যে দুচারবার হাতগুলো ছুঁড়লো ও। তারপর ছুটে চলে গেল গুহার মুখের কাছে।

মুংলি আমিনার মাথার কাছে বসে পড়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—ছিঃ কেঁদনা। দেখো ঠিক আমরা সবাই বাড়ি ফিরে যাব।

আমিনাকে কাঁদতে দেখে এক এক করে ছোটরা ওর চার পাশে এসে বসেছিল। লিজা বলল—এসো আমরা এখানে বসে মজার একটা খেলা খেলি। আমিনা তুমি শুয়ে শুয়ে খেলবে, কেমন?

প্রিয়া বলল—তারপর আমি তোমাকে একটা ভারি সুন্দর গল্প বলব। মা আমাকে বলেছে। শুনবে?

রাজা বলল—এসো তার থেকে আমরা সবাই মিলে একটা গান গাই। তুমি গান গাইতে পার?

আস্তে সেখান থেকে উঠে এল মুংলি। আমিনার জ্বর হয়েছে। সুধু মলম দিয়ে কি আর ওর ব্যথা কমানো যাবে? ওর এখুনি হাসপাতালে যাওয়া উচিত।

সমস্ত গুহার মধ্যে তখন যেন কেমন একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে। এক জায়গায় বসে কি যেন ভাবছে ক্যাপ্টেন। তার পাশে চুপ করে বসে আছে বিলি টম আর হামিদুল। গুরুদিৎ অন্য পাশে বসে গুহার ছাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। আসলে ও ওর মুখের ভাব কাউকেই দেখাতে চায় না—তাই।

ভয়ে অন্যদিকে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে রাধারাণী, তার পাশেই আছে রুক্মিনী, শান্তা আর শকুন্তলা। কুণাল ঝুঁকে পড়েছে ফার্স্ট এইড বাক্সটার উপরে। কি যেন খুঁজছে সেখানে।

আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেনের সামনে এসে দাঁড়াল মুংলি।

—কিছু বলবে তুমি?

—আমিনার জ্বর হয়েছে। জ্বরের ঘোরেই ও অমন চুপ করে আছে।

—জ্বর হয়েছে!

—হ্যাঁ। এখুনি একবার ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারলে ভাল হতো। ভয় করছে আমার।

লাফ দিয়ে উঠল টম। বলল—এসো আমার সাথে।

গুহার মুখের কাছে বাইরে কেমন যেন ক্লান্তভাবে বসে আছে গ্রাটেনকো আকাশের দিকে তাকিয়ে। ওদের পায়ের সাড়া পেয়ে মুখ ফিরালো।

—কি চাস?

—রেডিও যন্ত্রটা।

—কেন?

—আমিনার জ্বর হয়েছে। ডাক্তারের সাথে কথা বলবো।

—জ্বর হয়েছে! কেন হল?

—তুমি দেখনি কি ভীষণ চোট লেগেছে ওর।

—ওষুধ তো দেওয়া হয়েছে! তবে?

—ওতে কি সারে?

—নে। গলা থেকে যন্ত্রটা খুলে এগিয়ে ধরল গ্রাটেনকো।

—যা খুশি তোরা বল। ঐ মাথা-মোটা লোকগুলোর কি এ সবে হুঁস আছে? ওরা শুধু চেনে গ্রাটেনকোকে আর ফাঁসির দড়ি। না না অত সহজে সে দড়ি গলায় পরবে না গ্রাটেনকো। গ্রাটেনকোর দয়া নেই, মায়া নেই। ও শয়তান। আস্ত শয়তান।—নিজে বাঁচার জন্য ও সবাইকেই মারতে পারে।—

যন্ত্রের চাবি টিপতেই শুনতে পেল টম ওদিক থেকে কি যেন সব আবোল তাবোল বলছে ওরা। অবাক হল ও —এর মানে?

—ক্যাপ্টেন। ও ডাকল ভয় পেয়ে।—তুমি শোন তো।—

তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা হাতে নিল রাণা। মন দিয়ে শুনল কিছুক্ষণ তারপর বলল!—কাগজ কলম আছে কারও কাছে?

গুরুদিৎ এগিয়ে এসেছিল সামনে। ও তাড়াতাড়ি ওর পকেট থেকে কলমটা এগিয়ে দিল। এত গোলমালেও খাবার দেওয়া জিনিসটাকে ও ঠিক সামলে রেখেছে। খাবারের মোড়ক একটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি তাতে লিখতে লাগল রাণা—যা যা শুনতে পেল ঠিক তাই। সে লেখার উপরে ঝুঁকে পড়ল সকলে। অসম্ভব! এর তো কোনই মানে হয় না।

কিন্তু বারবার ওরাই বা একথা গুলো বলছে কেন? হঠাৎ নীচু হয়ে ফিসফিস করে গুরুদিৎ বলল।—সংকেত!

—বুঝছো না। এ সংকেত। গ্রাটেনকো যাতে বুঝতে না পারে তাই এমন করেছে। বলে হাত বাড়িয়ে দিল—দাও কাগজটা আমাকে দাও।

যন্ত্রটা টমের হাতে ফেরত দিল রাণা। টম চাবি টিপে ডাকলো—হ্যালো হ্যালো·····শুনেছি তোমাদের কথা। ডাক্তার চাই।

ডাক্তার এলো—বলল—তুমি ভয় পেওনা বোন। ওষুধের বাক্সে সিরিঞ্জ আছে। ওষুধ আছে এখুনি একটা ইনজেকশন দিয়ে দাও।

বারবার জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিল মুংলি কি করতে হবে। তারপর নিজের মনকে শক্ত করে আমিনাকে ইনজেকশন দিল।

ওদিক থেকে ততক্ষণে প্রেসিডেন্টের শেষ অনুরোধ গ্রাটেনকোকে জানানো হয়েছে। গ্রাটেনকোর স্পষ্ট উত্তর

চলে গেছে।—ওর দয়া মায়া নেই। ও আগে মুক্তি চায়!

ওকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে দিলেই তবে ও জানাবে বন্দীদের ও কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তার উত্তরে ওদিক থেকে বলেছে—বেশ কঘণ্টা বাদে ওকে জানানো হবে প্রেসিডেন্টের উত্তর।

রাগ করে আবার যন্ত্রটাকে কেড়ে নিল গ্রাটেনকো।

তারপর পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল আমিনার মাথার কাছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখল মুংলি কেমন করে ইনজেকশন দিল। ইনজেকশন দেওয়া হয়ে যাবার পর জিজ্ঞাসা করল—এখন একটু ভাল লাগছে তো তোমার? সবাই অবাক হয়ে ভাবল—কি আশ্চর্য। গ্রাটেনকোর মুখে তুমি!

প্রশ্নে কিন্তু আমিনা কোনই উত্তর দিল না। দুচোখ বেয়ে ওর শুধু দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে আবার পাগলের মতন দুচার বার শূন্যে হাত ছুঁড়ল গ্রাটেনকো। তারপর একরকম ছুটেই গুহা থেকে বাইরে চলে গেল।

টম বলল—কিছু বুঝতে পারলে গুরুদিৎ?

বলল—যে কোরেই হোক এর মানে আমাদের বুঝতে হবে।

কাগজটা মাটিতে পাতল গুরুদিৎ।

—একটা কথার মানে আমি করতে পেরেছি—তোমাদের কজনকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম মানে কি জানো—তিন। আমরা তো পনের জন আছি সব সুদ্ধ। তমুক্কা দিদি আর গ্রাটেনকোকে বাদ দিলে।

বিলি বলল—তারপর?

—সে কথাটাই পড়বে। কিন্তু প্রতি তৃতীয় নম্বর কথাটা পড়লেও তো কোন মানে হয় না!

টম বলল—সুরু কিন্তু শেষ—লিখেছে কেন?

—সুরু মানে যদি ধরি—আসল সংকেতের সুরু এখান থেকেই—তবে কি হয়?

—তবে শেষ কথাটার কি মানে!

সবাই ভাবতে বসল। হঠাৎ গুরুদিৎ বলল।

—হয়েছে। আচ্ছা দেখ শেষ লাইনটা লিখছে—দাঁড়ি কমা লেখা গুলো কেটে দি তাহলে কি দাঁড়ায়। রাণা কাগজটা তুলে নিয়ে বলল, কিন্তু কোনখান থেকে পড়তে আরম্ভ করব?

—ঠিক—সুরু কিন্তু শেষ দাঁড়ির পর থেকে। বলল গুরুদিৎ রাণা পড়ল,—আমরা রাতেতে ফানুষটা মজা করে গগনে হঠাৎ বেঁধেছি লোহার কপাট খুলে রোজ মা কাছে ডাকে জলে লঙ্গর খুলে পড়ে গোবিন্দ পদর নয়শ সাতাশ বস্তার ধান ঘুণ।

গুরুদিৎ বলল—আচ্ছা এবারে আমরা আবার প্রথম লাইনে ফিরে যাই—তিন সংখ্যাটার কি মানে হচ্ছে? প্রতি তিন নম্বর কথা ধরলেও তো কোন মানে হয় না।

টম বলল—আরও একটা লাইন তোমরা ছেড়ে যাচ্ছ। শেষ লাইনে লিখেছে—দুটো অক্ষরই বাজে। এর মানে কি?

—দাঁড়াও দাঁড়াও। ব্যস্ত হয়ে বলল গুরুদিৎ। গুঁতো খেয়ে মাথাটা এখনও আমার ঝিম ঝিম করছে। নইলে এ সংকেতের মানে খুঁজে পেতে এত দেরী হয়!

বলে ও লেখা গুলোর দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—হয়েছে!

—কি হল? সবাই এক সাথে জিজ্ঞাসা করল।

—কি মোটা মাথা আমার! আরে প্রতি দিন নম্বরের অক্ষরটাই ধর না তাহলে তো সামনে দুটো করে অক্ষর একেবারে বাজে হয়ে যাবে। দেখ এবারে নিশ্চয়ই কোন মানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

রাণা আবার কাগজটা তুলে নিয়ে থেমে থেমে পড়'ল—রাতে সজাগ হবে। লোক খুঁজছে জঙ্গলে।

গোপন! সাবধান!!

—সাবাস গুরুদিৎ। বলল হামিদুল। —আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছিল না।

টম বলল—শিগ্‌গির এর একটা উত্তর লেখ সংকেতে। কঘণ্টা বাদেই তো প্রেসিডেন্টের মতামত শুনতে হবে। তখুনি আমাদের উত্তরটাও দিয়ে দেব।

রাণা বলল—এসো গুরুদিৎ এর উত্তরটা আমরা বানাই এখুনি। গ্রাটেনকো ফিরল বলে। তার আগেই লেখা শেষ করতে হবে।

গুরুদিৎ বলল—ওরা যে নিয়মে লিখেছে সে নিয়মেই আমরা লিখব। তাতে ওরা বুঝতে পারবে যে ওদের কথা আমরা বুঝতে পেরেছি।

—সে তো নিশ্চয়ই। বলল—রাণা।

দুজনে বহুক্ষণ ভেবে বহু কাটাকুটি করে শেষ পর্য্যন্ত লিখল—সিনেমা এখানেই সবুজ দাঁড়ি মাঝে মাঝে ছিল কি নীল কমা কচু বা গাজর তুমি খাও দাঁড়ি রস বা গুড়ের হালুয়ায় যদি বল ফন্দী আছে—তা হাওড়ার আতা বা বড়ি নিয়ে এসো দাঁড়ি বোসো দাঁড়ি।

গুরুদিৎ বলল—ঠিক হয়েছে। এখন এখবর পাঠাতে হবে। আর রোজ রাতে আমাদের পালা করে জেগে থাকতে হবে।

টম বলল—ক্যাপ্টেন এখুনি এসো আমরা ঠিক করে ফেলি—কে কখন রাত জেগে পাহারা দেবে। আর কারা কারা দেবে।

এ কাজে সবাই রাজি। কিন্তু ক্যাপ্টেন ছোটদের একেবারে বাদ দিল। ঠিক হল এ দায়িত্ব ভাগ করে নেবে টম বিলি রাণা আর হামিদুল। গুরুদিৎকেও এর থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ মুংলি রাজি নয়। ও যে সম্পূর্ণ সুস্থ তার প্রমাণ কই? শেষে আবার যদি কোন কিছু হয়?

রুক্মিণী শকুন্তলা আর শান্তার উপরে ভার পড়ল, ওরা সব বাচ্চাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবে রাত্রি বেলা যদি ডাকা হয় তো কেমন করে চুপচাপ সবাই উঠে চলে আসবে। রাণা বলল—চল এখবর তমুক্কাদিদিকে শোনানো যাক তার সঙ্গেও এ নিয়ে পরামর্শ করতে হবে। হাজার হোক বয়সে উনি অনেক বড়।

* * *

খবর শুনে মহা খুশি তমুক্কা।—বলল—আজ না হয় কাল নিশ্চয়ই আমরা ফিরতে পারবো। আর যদি ওরা নাও আসে তবুও।—তা কি করে হবে। বলল রাণা।—আমি বলছি গ্রাটেনকোই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এ বিশ্বাস আমার হয়েছে।

—কিঁ করে।

—কাল রাতের কথা জিজ্ঞাসা কর মুংলিকে। ও জানে সব। যে মানুষের মনে এখনও দয়ামায়া আছে—সে কখনও আমাদের এত কষ্ট দিতে পারবে না। লক্ষ্য করনি তোমরা—গ্রাটেনকো এখনি কত বদলে গেছে। ও নিজেও আর আমাদের সবার এ কষ্ট সইতে পারছে না।

—কিন্তু ও ফিরে গেলে তো শুনেছি ওর ফাঁসি হবে। তা হলে কি ও ফিরতে পারবে?

—পারবে। খুব নিশ্চিন্ত ভাবে বলল তনুক্কা—এতগুলো শিশুর জীবনের কাছে ওর জীবনের দামটাকে ও বড় করে দেখতে পারবে না। আমি ওকে ফেরাবো। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রাণা তারপর বলল—কিন্তু ও মরুক এতো আমরা কেউ চাইনা।

এ কথার পর আর কোন কথাই বলতে পারল না তনুক্কা। সবার মনে যে আশা জেগেছিল তা আবার মিলিয়ে গেল। টম বলল—যদি আপনি ওকে রাজী করাতে পারেন তনুক্কাদিদি তবে আমরা বাধা দেব না। আমিনার ও আপনার এখুনি হাসপাতালে যাওয়া উচিত।

বিলি বলল—আর আমাদের ভাল করলে আমরা সবাই ওর জন্য এদেশের প্রেসিডেন্টকে বলবো ওকে ছেড়ে দিতে। উনিও হয়ত শুনবেন আমাদের কথা।

এমন সময় বাইরে থেকে ফিরল গ্রাটেনকো। ফিরে সোজা গিয়ে দাঁড়াল আমিনার কম্বলের কাছে। কেঁদে কেঁদে আমিনা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আস্তে নীচু হয়ে ও হাত রাখল আমিনার কপালে। জ্বর আছে বুঝতে পেরে কেমন যেন অসহায়ের মতন তাকাল। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজে বার করল মুংলিকে--জিজ্ঞাসা করল-এখন কেমন আছে ও?

একথার কোন উত্তর দিল না মুংলি। মুখ ফিরিয়ে চলে এলো ওখান থেকে। তাই দেখে স্প্রিংএর মতন সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রাটেনকো। ভীষণ ভাবে চিৎকার করে উঠল—কেউ তোরা কথা বলছিস না কেন? কেমন আছে ও এখন?

কাউকে কিছুই বলতে হল না। আপনা থেকেই সবাই মুখ নীচু করে সরে গেল ওর সামনে থেকে।—কেউ কথা বলবে না আমার সাথে! কেউ না?—মজা দেখিয়ে দেব আমি সবাইকে।

হাতপা ছুঁড়ে গর্জন করতে লাগল গ্রাটেনকো। অবাক হয়ে দেখল ও কেউ ওকে আর এতটুকুও ভয় করে না। এমন কি ঐ বাচ্চাগুলোও না। সবাই ওর কাছ থেকে সরে চলে গেছে।

সব কটাকে আমি গুলি করে মারবো কুকুরের মতন। সব কটাকে। দেখিয়ে দেব এ জঙ্গলে গ্রাটেনকোর কথা না শোনার ফল।

হাতের স্টেনগানকে ও সত্যিই বাগিয়ে ধরল। কিন্তু ভীষণ ঘাবড়ে গেল দেখে যে ঐ পাগল ক্যাপ্টেনটা তার বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসেছে সব কটা গুলিকে একাই বুকে নেবে বলে। ধাঁই করে স্টেনগানটা ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্রাটেনকো। কি হবে আর ওটা দিয়ে ওর? এ ছেলেগুলো যখন ওটাকে আর ভয়ই করে না। একি অপমান! এ কি লজ্জা! একি ভীষণ হার ডাকাত গ্রাটেনকোর! মনে হল ওর ও ছুটে এখুনি পালিয়ে যায় উত্তর মাজিনকোর ঘন জঙ্গলে। সে জঙ্গলই ওর ভাল। কোন মানুষের সাড়া সেখানে নেই। নেই মিনিটে মিনিটে মিনিটে এমনি করে কতগুলো খুঁদে শয়তানের হাতে হার মানা। না হয় নাই পাবে ও মুক্তি সারা জীবন ভোরে। ডাকাত গ্রাটেনকোকে তো তবু ভয় করবে সারা দেশ!

পালিয়ে হয়তো সে সত্যিই যেত। কিন্তু থেমে গেল কতগুলো ছোট ছোট ব্যথার আওয়াজ শুনে।

—আঃ আঃ উঃ। আমি জল খাব।—ঘুম ভেঙ্গে গেছে আমিনার স্টেনগানটা পড়ার শব্দে।

ছুটে গিয়ে গ্রাটেনকো জল নিয়ে এলো একটা ছোট পাত্রে। মাটিতে বসে মহা যত্ন করে তুলে ধরল আমিনাকে এক হাতে নিজের বুকের মধ্যে। অন্য হাতে জলের পাত্রটা ধরল ওর মুখের সামনে।

গুহা সুদ্ধ ছোট বড় সবাই তখন অবাক। এক নিশ্বাসে সবটুকু জল খেয়ে ফেলল আমিনা।

আস্তে ওকে আবার শুইয়ে দিল গ্রাটেনকো। উঠে দাঁড়িয়ে ওর গলায় ঝোলানো রেডিও যন্ত্রটা খুলে এগিয়ে ধরল টমের দিকে। দেখতো ঐ মাথা মোটা লোকগুলোর মাথায় নতুন কোন বুদ্ধি খেলল নাকি।

চাবি টিপে ডাকল টম—হ্যালো হ্যালো উত্তরে শুনতে পেল ওদিক থেকে তখনো সমানে বলে চলেছে সেই সংকেত। আর একটুও দেরী করল না টম। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কাগজটা বার করে স্পষ্ট গলায় আস্তে আস্তে পড়ে গেল সব সংকেতটা। একবার দুবার তিনবার। বেশ কিছু সময় ধরে।

—হচ্ছে কি এসব? অবাক গ্রাটেনকো চেঁচিয়ে উঠল। —মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো তোর?

—না আমি ভালই আছি। বলল টম।

—তবে বন্ধ কর এ ছেলেখেলা। জিজ্ঞেস কর ওরা আমার সর্ত মানতে রাজী কিনা। আমাকে ছেড়ে দিলেই আমি তোদের ছেড়ে দেব।

ওদিক থেকে ওরা স্পষ্ট করে আবার ও বলল: কোথায় লোক নাবাবে বলতে বল আগে। তাদের হাতে সবাইকে ফেরত দিলেই গ্রাটেনকো ছাড়া পাবে। এর বেশী আর কোন কিছুই বলার নেই।

—তার মানে ওরা আমাকে প্রাণে মারতে চায়। মরতে আমি চাই না। ছটফট করে উঠল গ্রাটেনকো। ওরা কেন একটু সামান্য কিছু বলছে না যাতে আমি বুঝতে পারি আমাকে ওরা দড়িতে ঝোলাবে না। তবেই তো আমি তোদের সবাই কে এখুনি ফেরত দিতে পারি।—আমার প্রাণের দামটা কি এতই বেশী? উঃ.উঃ।

ওদিক থেকে ওরা আবার ও বলল—শেষ বারের মতন বলছি সবার সাথে ধরা দিক গ্রাটেনকো। তার পরেই তাকে নিশ্চয়ই মুক্তি দেওয়া হবে।

—না না না। পাগলের মতন চিৎকার করতে লাগল গ্রাটেনকো। মরুক সবাই মরুক। তাই চায় ঐ মাথামোটা লোকগুলো। আমাকে তো মারবে না ওরা মারবে তোদের। বন্ধ কর ঐ কথা বলা কলটা ওটা আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

কেউ বাধা দেবার আগেই। এক লাফে যন্ত্রটা টমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গুহার দেওয়ালে আছাড় মারলো ওটাকে। চুর চুর হয়ে ভেঙ্গে গেল যন্ত্রটা। ফিরে দাঁড়িয়ে মাটি থেকে স্টেন গানটা তুলে নিয়ে ঝড়ের মতন বাইরে চলে গেল গ্রাটেনকো।

প্রেসিডেন্ট ভাবেন নি যে এত তাড়াতাড়ি ছেলেরা সংকেতের উত্তর দিতে পারবে।

* * *

আরডন বললেন—আমার কিন্তু এ বিশ্বাস বরাবরই ছিল। এখন বলুন কি করা উচিত।

প্রেসিডেন্ট বললেন।—গ্রাটেনকোর শেষ কথায় বোঝা যাচ্ছে ও নিজে থেকে স্বেচ্ছায় বন্দীদের মুক্তি দেবেনা। সারা দেশের কাগজগুলো এমন কি বিদেশের কাগজগুলো পর্যন্ত আমার গভর্ণমেন্ট সম্বন্ধে যা তা লিখছে। এ অবস্থায় আর আমরা গ্রাটেনকোর দয়ায় বসে থাকতে পারি না।

জেনারেল বললেন। আমার সৈন্যদলও তৈরী হয়ে বসে আছে প্রেসিডেন্ট হুকুমের অপেক্ষায়। বাকি কাজটা তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক।

—বেশ তাই হোক। আজ রাতেই এ নাটকের শেষ করা চাই। গম্ভীর ভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট।

—তাই হবে। আজ রাতের অন্ধকারে আচমকা হামলা করবে ওরা। এখন আসুন ম্যাপ দেখে কোথায় ওদের নাবান হবে তাই ঠিক করা যাক।

আরডন তাঁর ম্যাপটা পাতলো টেবিলের উপরে। তার উপরেই সবাই ঝুঁকে পড়লেন।

আরডন বললেন ওরা যে সংকেত পাঠিয়েছে তার থেকে আমরা জানতে পারছি ওদের বন্দী করা হয়েছে নীচু জমির গুহায়। সেটা কোন জায়গা হতে পারে? আমি যতদূর জানি মাজিনকোর মালভূমিতে কোন নীচু জায়গা নেই। বাদে টিবল্লি নদীর মরা খাদ। সেখানে আমি নিজে যাইনি বটে তবে বহুদিনের বুড়ো কাঠুরে যারা এখনও বেঁচে আছে তারা বলে কয়েকশো মাইল লম্বা ঐ মরা খাদের গোলক ধাঁধায় কোথাও একটা গুহা থাকা সম্ভব। ও গোলক ধাঁধায় মানুষ ঢুকলে বের হওয়া মুস্কিল। লুকাবার পক্ষে ও জায়গাটা খুবই চমৎকার।

জেনারেল বললেন—সংকেতে উত্তর মাজিনকোর কোন জায়গাকে বোঝাতে পারে কি?

—না। বললেন আরডন। উত্তর মাজিনকো আমার ভাল করে ঘোরা আছে সেখানে কোন নীচু জায়গায় গুহা থাকা সম্ভব নয়।

—তাহলে টিবল্লি নদীর দক্ষিণেই আমরা জোর দেব বেশী।

—হ্যাঁ বিশেষ করে মরা নদীর খদে—বললেন আরডন। আমার বিশ্বাস ওখানেই গ্রাটেনকো লুকিয়েছে।

—বেশ একথা আমার মনে থাকবে।

প্রেসিডেণ্ট বললেন—আমার কিন্তু একটা অনুরোধ আছে জেনারেল।

—বেশ বলুন।

—আপনার সৈন্য বাহিনী যদি বিনা যুদ্ধে কাজটা উদ্ধার করতে পারে তবেই আমি সব থেকে বেশী খুশি হব। একথা শুনে একটু হাসলেন জেনারেল—বললেন। সে কথাও আমার মনে থাকবে প্রেসিডেণ্ট। তবে আপনিও ভুলবেন না শয়তানটার হাতে সব রকমের অস্ত্রই আছে। কদিন আগেই সে টপকীর পুলিশ চৌকী লুট করেছে।

—তা জানি। কিন্তু আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারছিনা অনেকগুলো শিশুর জীবনমরণ নির্ভর করছে কি ঘটবে তার উপরে: সে শয়তান আমার কথা শুনবেনা। আপনার সেনাবাহিনী যেন মনে রাখে আমার অনুরোধ।

দু পায়ের গোড়ালি একসাথে ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন জেনারেল। শান্ত গলায় বললেন—আপনার অনুরোধ আমাদের কাছে আদেশ প্রেসিডেণ্ট।

আরডন বললেন—আমারও একটা অনুরোধ আছে জেনারেল।

—বলুন।

—আপনার সেনা বাহিনীর সাথে আমিও নাবব জঙ্গলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেনারেল বললেন—বেশ। দ্বিতীয় দলের সাথে আপনি যাবেন হেলিকপ্টরে। সে ব্যবস্থা আমি করব

* * *

প্লেনটা আবার মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেল। বোধ হয় বিকেলের জন্য জিনিসপত্র ফেলে গেল। কিন্তু গ্রাটেনকোর দেখা নেই। সেইযে সে বার হয়ে গেছে তারপর আর ফেরেনি।

এখন কি করা উচিত তা ভাবতে বসল রানা আর টম।

হামিদুল বলল। তুমি হুকুম দিলে আমি আর বিলি যাব দেখতে।

বিলিও তাতে রাজী। কিন্তু ভেবে পেলনা রাণা যাওয়া উচিত হবে কিনা।

পথের খবর যা শুনেছে ওদের কাছ থেকে তাতে মনে হয় ওরা হয়ত বাইরে বার হয়ে যেতে পারবে কিন্তু

ফিরে আসতে পারবে কি চিনে ?

বিলি বলল—একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি।

যদি কাছে পিঠে কোথাও জিনিসগুলো ফেলে থাকে তবে হয়ত সন্ধ্যে হবার আগেই ফিরে আসতে পারবো। তমুক্কা এতক্ষণ চুপ করে ছিল—বলল। আমার মনে হয় তোমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। যদি পথ খুঁজে না পাও তবে বিপদ হবে। তাছাড়া আমাদের যখন লোক আসছে—তখন আমাদের সকলেরই এখন এক সাথে থাকা উচিত।

টম বলল—কিন্তু যারা খুঁজতে আসবে তারাও কি এ ভীষণ গোলক ধাঁধার পথ খুঁজে পাবে ? হয়ত ওরা এদিকে আসবেই না।

রাণা বলল—সে ভয় আমারও।

বিলি বলল—একটা কাজ করলে হয় না। এসো আমরা গুহার বাইরে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া করি। অনেক দূর থেকে সে ধোঁয়া দেখা যাবে। তাতে হয়ত ওরা পথ খুঁজে আসতে পারে।

তমুক্কা বলল—এটা মন্দ বুদ্ধি নয়।

—কিন্তু গ্রাটেনকোও তো সে ধোঁয়া দেখতে পারবে। বলল রাণা—ওকি তখন ক্ষেপে যাবে না ?

টম বলল—ওকে আর ভয় করলে আমরা সব সুযোগই হারাবো। আগুন জ্বালানো হোক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তমুক্কা বলল। গ্রাটেনকোকে সামলাবো আমি। তোমরা আগুন জ্বালো। বেশ বড় আগুন যেন খুব ধোঁয়া হয়।

—বেশ এসো তাই করি আমরা।

যেখান থেকে যা কিছু পেল তাই এনে ওরা জড়ো করল গুহার বাইরে একটা জায়গায়। শুকনে কাঁটা ঝোপ ভেঙ্গে এনে তার উপরে চাপালো হামিদুল। বিরাট একটা স্তূপ হলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল টম। পট পট শব্দ করে আগুন জ্বলে উঠল। বাইরে তখন বেলা পড়ে এসেছে। আগুন একটু জ্বলে উঠতেই একটা ভিজে কম্বল এনে তার উপরে ফেলল টম। দেখতে দেখতে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। তাই দেখে মহা আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাচ্চার দল।

—আরও যা কিছু পারো এনে ফেল আগুনে। ব্যস্ত হয়ে বলল রাণা।

সবাই ছুটল হাতের কাছে যা পায় তাই এনে আগুনে ফেলতে। আগুনকে এখন নিভতে দেওয়া হবে না। বন্ধ যেন না হয় ধোঁয়ার কুণ্ডলি। আকাশের অনেক দূর পর্যন্ত যেন তা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে পারে। তবেই না দেখতে পারবে বাইরের জগতের লোকেরা।

সবাই ব্যস্ত আগুন নিয়ে। কারও কোন দিকে খেয়াল নেই। ধোঁয়ায় সকলের চোখ জ্বালা করছে। ছুটে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়েই আবার দাঁড়াচ্ছে তারা আগুনের পাশে। খিদের কথা ভুলে গেছে ওরা। ভুলে গেছে গ্রাটেনকোর কথা। সবার মনে এক কথা—প্লেন আসছে না কেন ? কেন কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বাইরের লোকদের ? তবে কি সব চেষ্টাই ওদের মিথ্যে হয়ে গেল ? আগুন ক্রমে নিভু নিভু হয়ে এলো। ধোঁয়ার কুণ্ডলিও ছোট্ট হতে হতে এক সময়ে হাওয়ায় মিশে গেল। প্রায়নিভন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে সবার মন খারাপ হয়ে গেল। কেউ তাহলে এ আগুন দেখতে পায় নি।

দুহাতে চোখ মুছে শেষ বারের মতন আগুনের দিকে চোখ ফেরালো রাণা। আগুন পেরিয়ে সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বুকের রক্ত ওর ভয়ে জমে গেল। আগুন পেরিয়ে ঠিক সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে

গ্রাটেনকো। যেন একটা পাথরের মূর্তি। হাতে ধরা ওর স্টেনগান। কি করবে ভেবে পেল না রাণা। আস্তে হাত দিয়ে ঠেলা দিল ও পাশেদাঁড়ান টমকে। চমকে টম ফিরে তাকিয়ে থমকে গেল। একে একে সবাই দেখল গ্রাটেনকোকে। কারও মুখে কোন কথা নেই। কেউ জানে না এখন কি ঘটবে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে রাণা বলল। সকলে ভিতরে চল। আর বাইরে থাকার দরকার নেই। এসো আমার সাথে।

নিঃশব্দে সবাই ভিতরে ঢুকল! এত চিৎকার এত কথাবার্তা হঠাৎ এমন করে থেমে গেল কেন! ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল তনুক্কা। তবে কি গ্রাটেনকো ফিরেছে? নিশ্চয়ই। নইলে অমন করে সবাই ফিরে আসতো না।

ভিতরে ঢুকে রাণা সোজা এসে দাড়ালে তনুক্কার পাশে।

—ফিরেছে গ্রাটেনকো? জিজ্ঞাসা করল তনুক্কা।

—হ্যাঁ। ছোট্ট করে একটা উত্তর শুধু দিল রাণা।

—উঃ এখন যদি আমার পা দুটো ঠিক থাকত। ছটফট করে উঠল তনুক্কা।—তোমরা সবাই ভিতরে এসে এদিকে বস। আগে আমি কথা বলব গ্রাটেনকোর সাথে। তোমরা সবাই চুপ করে থাকবে।

সবাই ওর হুকুম মতন গুহার অনেক ভিতরে সরে এল। ঠিক তখনি নিঃশব্দে গ্রাটেনকো গুহার মধ্যে ঢুকল।

গানটা অবহেলায় দেওয়ালের একপাশে নাবিয়ে রেখে শান্তভাবে এসে দাঁড়াল আমিনার বিছানার পাশে।

মুংলি সাহস করে বলল—ও এখন একটু ভাল আছে। ইনজেকশনে কাজ দিয়েছে।

এসব কথার ও কোন জবাবই দিল না। একটু ঝুঁকে আমিনার কপালের উপরে হাতটা রাখল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর নিঃশব্দেই আবার বার হয়ে গেল।

সবাই অবাক? এ কেমন হল। কোন কথাই গ্রাটেনকো জিজ্ঞাসা করল না! চেঁচালো না। তাতেই যেন ওকে বেশী মানাতো। এ গ্রাটেনকোকে তো ওরা কেউ চেনে না।

তনুক্কা ডাকল—ক্যাপ্টেন।

—হ্যাঁ বলুন।

—একটু সাহস করে একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

—কি কাজ?

—বাইরে গিয়ে দেখ গ্রাটেনকো কোথায় গেল। ওকে বল আমি ডাকছি। আমার মনে হয় ও আসবে।

—আমি যাচ্ছি এখুনি।

বাইরে এসে গ্রাটেনকোকে কোথাও দেখতে পেল না রাণা। এত অল্প সময়ের মধ্যে ও গেল কোথায়? কিছুটা এগিয়ে এদিক ওদিক একটু খুঁজে দেখল ও। না কোথাও ত নেই। অনেক দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এল রাণা।

—ওকে কোথাও পেলাম না।

সে কি? ও গেল কোথায়? অবাক হয়ে তনুক্কা বলল।

টম বলল—আমার মনে হয় ও গেছে প্লেনের মালগুলো নিয়ে আসতে। এখুনি ফিরবে ও।

—হয়তো তাই। বলল তনুক্কা।—যাই হোক ও ফিরলে আগে আমি কথা বলব ওর সাথে, মনে থাকে যেন একথা।

—আচ্ছা। বলল রাণা।

টম যা বলেছিল ঠিক তাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গ্রাটেনকো ফিরল বোঝা বয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বোঝাটা গুহার এক পাশে নামিয়ে ও বোধ হয় আবার বাইরেই চলে যাচ্ছিল।

তমুক্কা ডাকল—শোন গ্রাটেনকো।

ডাক শুনে দাঁড়াল গ্রাটেনকো।

—তোমার সাথে কথা আছে আমার। দরকারি কথা।

—আমার সাথে দরকারি কথা? গ্রাটেনকো ফিরে বলল। আমার সাথে তো কেউই কথা বলে না।

—আমি বলব। এসো এদিকে। এসে বোস। একটু ইতস্তত করল গ্রাটেনকো। সে শুধু কিছুক্ষণের জন্য। তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ল মাটির উপরে তমুক্কার কাছে।

—কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?

—তাতে তোমার কি দরকার?

—আমাদের ফেলে তুমি যেতে পারবে না।

—থেকেই বা কি করব আমি? আমাকে আর কিসের দরকার তোমাদের?

—অনেক দরকার আছে। তোমাকে ছাড়া আমাদের চলবে না।

—আমি ডাকাত আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন কাজই হবে না।

—গ্রাটেনকো আগে তুমি মানুষ তারপর তুমি যাই কিছু হওনা কেন।

—মানুষ! আমি!

—হাঁ গ্রাটেনকো। আমরা ফিরে যাব না বাড়ি?

—হাঁ যাও। আর আমি বাধা দেব না।

—কিন্তু যাব কেমন করে? সে কথাটা ভেবেছো?

—ধোঁয়ার নিশানা দেখে ওরা এসে যাবে। ওদের সাথে ফিরে যেও তোমরা।

—যদি না আসে? যদি ওরা এ গুহায় আমাদের খুঁজে না পায়, তবে?

একথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল গ্রাটেনকো তারপর বলল—আমাকে তুমি কি করতে বল?

—কাল সকালে তুমিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে! তুমিই তো আমাদের এনেছো এখানে।

—তা হবে না। আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই।

আমরাও বাঁচতে চাই। আমরা বাঁচলে তুমিও বাঁচবে।

—কেমন করে! ফাঁসির দড়িতে ঝুলে?

—না গ্রাটেনকো, ও তোমার মিথ্যা ভয়।

—ভয়! হাঁ সে ভয় আমার আছে। তবে তা মিথ্যা নয়। ভুলে যেওনা, আমি খুনী আসামী। আমার মাথার দাম বহুটাকা।

—গ্রাটেনকো সে কথা আমরা বহুবার শুনেছি। কিন্তু তবুও বলছি তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। তাহলে আমরা বাঁচব। আমরা বাঁচলে তুমিও বাঁচবে। আমরা সবাই বলব প্রেসিডেন্টকে দয়া করতে। তিনি শুনবেন সে কথা।

—বিশ্বাস করিনা আমি এ ছেলেমানুষি কথা। অন্য কিছু বল।

—এত ভয় তোমার! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল তমুক্কা। তাকিয়ে দেখ তো একবার এই সব শিশুগুলোর

দিকে। দেখ ভাল করে গ্রাটেনকো। এদের সবার জন্যও তোমার মরতে ভয় করে? বেঁচে আছ তুমি এখন? এই কি বেঁচে থাকা? এমন করে মানুষ বাঁচে? এতো জঙ্গলের পশুর জীবন। তাড়া খেয়ে তাড়া করে বেঁচে থাকা। এমন পশুর মতন বেঁচে থাকার চেয়ে না হয় মরলে এই সব ছোট্ট শিশুগুলোর জন্য। তাহলে তো অন্তত এই সব শিশুগুলোর মনের মধ্যে চিরকাল তুমি বেঁচে থাকতে পারবে। এখন সবাই তোমাকে ভয় করে, ঘেন্না করে। তখন এরা তোমাকে ভালবাসবে! তোমার জন্য কাঁদবে।

—চুপ কর চুপ কর। এসব কথার কোন মানেই আমি বুঝিনা। আমি ভুল করেছি তোমাদের বন্দী করে। আমার সব কিছু তোমরা গোলমাল করে দিয়েছো। এখন চাইছো আমাকে মারতে।

—না গ্রাটেনকো এরা তোমাকে বাঁচাতে চায়। এরা তোমাকে ভালবাসে।

—মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! সবাই আমাকে ঘেন্না করে। সবাই ঘেন্না করে। ভয় পায় আমাকে।

অমন ভীষণ ডাকাতটা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। চুপ করল তমুক্কা। মুংলি ওর দল বল নিয়ে বোঝাটা খুলে ফেলেছিল এরি মধ্যে। তাড়াতাড়ি খাবারের বোঝাটা থেকে সবাইকে খাবার দিতে সুরু করে দিল। কারও মুখে কোন কথা নেই—নিঃশব্দে সবাই খেতে সুরু করল? বাইরে কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাতি জ্বালার সময়ও হয়েছে। কিন্তু কে জ্বালাবে? কান্না থামিয়ে গ্রাটেনকো দুহাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সেই যে বসেছে ওর নড়া চড়া নেই।

তমুক্কাই ডাকল—গ্রাটেনকো। ওঠো। তোমার খাবার খেয়ে নাও। আমরা জানি আমাদের খোঁজে আজ রাতে লোক আসতে পারে। এলে ভালই। না হলে কাল সকালে তুমি আমাদের নিয়ে রওনা দেবে। মুংলি ওর সামনে খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াতেই গ্রাটেনকো উঠে বার হয়ে গেল গুহা থেকে। ওকে বার হয়ে যেতে দেখে রাণা চেঁচিয়ে উঠল।

—যেওনা গ্রাটেনকো। শোন—অন্তত তোমার খাবার নিয়ে যাও।

ফিরেও তাকাল না গ্রাটেনকো। বাইরের অন্ধকারের মধ্যে হন হন করে মিলিয়ে গেল ও।

—যাব আমি ওকে ডাকতে? জিজ্ঞাসা করল রাণা।

—না। বলল তমুক্কা। এ অন্ধকারে আর বাইরে যেতে হবে না তোমাকে। ও ফিরে আসবে দেখো।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে গ্রাটেনকোর লুকান ভাঁড়ারে ঢুকল রাণা আর হামিদুল কতগুলো মশাল বানাতে। কোন কিছুর অভাব রাখেনি গ্রাটেনকো। বেশ কয়েকটা মশাল বানিয়ে তার একটা জ্বালিয়ে নিয়ে ফিরল ওরা।

সেটাই গুহার মুখে পুঁতে শোবার ব্যবস্থা করল ওরা।

রাণা বলল—আজ রাত থেকেই আমরা পালা করে জাগবো। প্রথমেই আমি।

টম বলল—আমাদের প্রধান কাজ হবে মশালটাকে জ্বালিয়ে রাখা যেন পথ খুঁজে পায় অন্ধকারে যারা আসবে তারা।

ঠিক হল রাণার পর জাগবে হামিদুল। তার পর বিলি। সবার শেষে টম।

গ্রাটেনকোর ফেলে যাওয়া স্টেনগানটা ওরা লুকিয়ে রাখল একটা দেওয়ালের ফাটলে। ওটা ছুঁড়তে পারে এমন কেউ নেই। কিন্তু ফিরে এসেও যাতে গ্রাটেনকো ওটা খুঁজে না পায় তার জন্য।

বলা তো যায় না কখন ওর মাথায় কি বুদ্ধি খেলবে।

সবাইকে শুয়ে পড়তে বলল রাণা।

তমুক্কা বলল—দরকার পড়লে আমাকে যেন ডাকা হয়। রাণা গিয়ে বসল গুহামুখের কাছে' বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ও যেন কেমন হতাশ হয়ে গেল। এই গোলক ধাঁধার মধ্যে কি বাইরের লোক ঢুকতে পারবে? কারা আসবে ওদের খোঁজে? তারা কজন? অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসবে কি তারা? ডাক্তার থাকবে কি তাদের সাথে? গ্রাটেনকোই বা গেল কোথায়? কি মতলব আছে তার মাথায় কে জানে? একটুখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে উঁচু জমি পার হয়ে। সেখানে হাজার তারার আলো মিট মিট করে জ্বলছে। সে দিকে তাকিয়ে নানান কথা ভাবতে লাগল রাণা। ক্রমশঃ

একটি বিরাট চিন্‌তে

চুনী দাশ

সানুর বড় ইচ্ছে করে
দোকানেতে যায়
বিস্‌কুট টফি লজেন্‌স কিনে
সাধ মিটিয়ে খায়!

পয়সাও যে জমলো অ-নেক
এক দুই তিন চার
উল্‌টে পাল্‌টে ওদের সানু
গুন্‌ছেই বারে বার!

রোজই খালি বলছে সবে,
বড় হলেই যেও
যা খুশি তাই কিনে তখন
ইচ্ছে মতন খেয়ো।

জামা জুতো হচ্ছে ছোট
বুঝছে সানু পষ্ট,
তবু ওকেই—বলছে ছোট
ওই তো সানুর কষ্ট!

সানুর মনে তাই ত এখন
একটি বিরাট চিন্‌তে,
বিস্‌কুট টফি লজেন্‌স্ সানু—
কখন যাবে কিন্‌তে!!

পাপের সাজা

'বিশ্বপ্রিয়'

বক্ বকম পায়রাদের আস্তানা রায় বাড়ির বার দেউড়িতে। এদিকে একটানা লম্বা কার্নিশ। নিচেয় গোটা চার বড় বড় থামের খিলান। তারই ফাঁকফোকরে জোট বেঁধে থাকে ওরা।

মুক্কি, লোটন, গোলা, গেরুবাজ—সব কটার নামও ছাই জানে না রিণ্টু। এ বাড়ির জানালা খুললে ও বাড়ির ছাদ দেখা যায়। সকাল বিকাল ঐ ছাদের ওপরেরই ঘোরে পায়রাগুলো।

ঝাঁক ঝাঁক পায়রা। কত রঙের—কত রকমের। সাদা, কালো, খয়েরি বুটিদার, ছিট্, পাঁশুটে, চাঁদ কপালী, নীল-কণ্ঠী। কোনোটার পেখম মেলা,—কোনোটার আবার ঝুঁটি বাঁধা। ঘুরছে ফিরছে। ঠোঁটে করে ঠুকে ঠুকে দানা খুঁটছে। নয়তো, ইচ্ছে হলতো—দল বেঁধে ফড় ফড় করে উড়ে

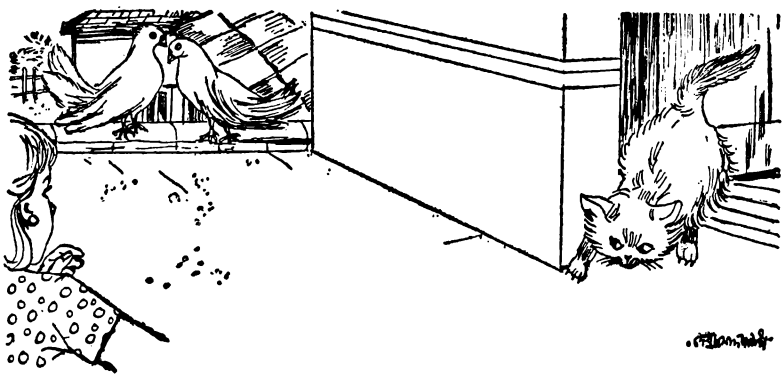

গেল আকাশে। গোটা দুই চক্কর দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশের আল্‌সেতে গিয়ে বসল আবার।

রিণ্টু লক্ষ্য করে এ সব। আর লক্ষ্য করে রায়গিন্নীর গালগলাফোলা, দুধসাদা লোমে ঢাকা ম্যাও ম্যাওকে। বেড়ালতো নয়—রায় বাড়ির সোহাগী পোষ্য। বাড়িতে বাটি ভর্তি ভর্তি দুধ খায়। খায় তাজা মাছের ভাজা পেটি। এত খেয়ে খেয়েও—ঐ ছোঁচাটার রাক্ষুসে খিদের আশ মেটেনা। ও চায় তাজা রক্ত। কাঁচা মাংস।

তাই লোভী দৃষ্টিজোড়াকে আধবোজা করে সব সময়ে বক্ বকম্‌দের লক্ষ্য করে। আর মাঝে মাঝে আল্‌সেমির হাই তুলে এমন ভাব দেখায়—যেন, আমি কিছুই দেখছি না অথচ মনে মনে মতলব—সুযোগ মত একটাকে যদি পায়তো এক্ষুনি ঘাড় মুটকে ধরে রক্ত চোষে। হাড় মাংস মুড় মুড়িয়ে চিবিয়ে খায়।

সেদিন সকালে—বক্ বকমরা ছাদে ঘুরে ঘুরে দানা খুঁটছিল। এমন সময় ম্যাও ম্যাও কার্নিসের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে চুপিসাড়ে এগিয়ে আসে। যেই না ওকে দেখা—বক্ বক্‌মরা সবাই ভয়ে ভয়ে জড়সড়। বক বকম্‌দের সর্দার তা' বুঝতে পেরেই চেঁচিয়ে ওঠে,—

বক্‌ম্‌ বকম—রকম সকম দেখে মনে হয়—
ম্যাও ম্যাওটার মনের গতি মোটেই ভাল নয়।
বাঁচতে যদি, সাধ থাকে,
পালাই রে চ' এই ফাঁকে :
নয়তো বিপদ ঘটবে কিছু—নেই তাতে সংশয়।

সর্দারের সতর্কতায় সজাগ হয় সকলে। ঝট্‌ পট্‌ ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যায় আকাশে। গোটা ছাদটা জুড়ে চক্কর দেয় ঝাক বেঁধে বেঁধে।

বাড়াভাতে ছাইপড়া অবস্থা তখন ম্যাও ম্যাওয়ের। তবু-নিরীহ, কত যেন ভাল মানুষটির মত গলায় বলে,—

বকম বকম পায়রা ভাই—
ঘরে থাকায় সুখ যে নাই,
তাই এসেছি খেলতে তোদের সনে :
আমায় দেখে ফুরুৎ করে—
দল বেঁধে সব পড়লি সরে,
ভয়টা তোদের কিসের এত মনে ?

কয়েকটা সাহসী পায়রা উড়ে গিয়ে চিলে কোঠার ছাদে বসেছিল। তাদের মধ্যে একজন উত্তর দিল,—

ম্যাও ম্যাও ম্যাও হতচ্ছাড়ি :
গোম্‌দা মুখী কেলে হাঁড়ি, তোর চাতুরীর ধারা—
পাখ্‌পাখালী সবাই বোঝে
কেউ ভেড়ে না তাই সহজে—তোর কাছেতে তারা

তাই না শুনে এক বিঘৎ লম্বা জিব্‌ কেটে ম্যাও ম্যাও—বলল—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ এমন কথা শুনলেও পায় হাসি—
নিন্দুকেরা দোষে আমায়, জেনে বাঘের মাসি।
বকম্‌ বকম্‌ পায়রা জুটি :
তোরা তো ন'স হিংসেকুটি,
তবে কেন খেলতে কি দোষ থেকে পাশাপাশি ?

ম্যাও ম্যাওয়ের মিষ্টি কথা শুনেও কারো মন গলেনা। সকলেই জানে ওর স্বভাব। ইঁদুর ছুঁচোরা তো ওকে সব সময়েই এড়িয়ে চলে। আর পাখিরা ? তারাও ভয় পায় যথেষ্ট। ঠিক যমের মত। তাই বক্‌ বকম্‌দের একজন ওকে মুখ ভেংচে বলে ওঠে,—

থাক থাক থাক—বড়াই জাহির
করিস নে আর পাজি :
সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে—
চলবে না কারসাজি।

এই না বলেই সে চত্বর থেকে সবাই দে চম্পট। এক্কেবারে ম্যাও ম্যাওয়ের নাগালের বাইরে! ফাঁকা ছাদ। মনের ক্ষোভ মনে ঢেকে-'মিঁয়াও' করে একটা করুণ ডাক ছাড়ে ম্যাও ম্যাও। শেষে গুটি গুটি পায়ে নিচের তলার দিকে পা বাড়ায়।

ম্যাও ম্যাও চোখের আড়াল হতেই-বক্ বকম্‌রা নিশ্চিন্তি। আবার এক সময় আকাশ ছেড়ে নেমে আসে ছাদের ওপর। 'বকম্ বকম্ আওয়াজ তোলে গালগলা ফুলিয়ে। চাল গমের ছড়ানো দানাগুলো খুঁটে খুঁটে খায়।

রিণ্টু লক্ষ্য করে—মোটা সোটা ধাড়ীগুলো চার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাচ্ছাগুলো আছে, মাঝখানে। ওদের মধ্যে দুটোর জুটি, কখন এক সময় যেন দল ছেড়ে একটু নিরিবিলিতে সরে এসেছে। বসেছে কার্নিশের একেবারে ধার ঘেঁসে। আদর করে কখনো কখনো এ ওর গা মাথা চুলকে দিচ্ছে।

এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল ম্যাও ম্যাও। নিচেয় ও নামেনি। লুকিয়ে তাক করে বসেছিল সিঁড়ির মুখোমুখি দরজাটার আড়ালে। এখন নিরিবিলিতে-আনমনা দুটো পায়রাকে বসে থাকতে দেখে, ওখান থেকেই লাফ দিয়ে ওদের ঘাড়ে পড়বার চেষ্টায় উঠে দাঁড়ায়। আনন্দে ফোলানো লেজটাকে এপাশে ওপাশে দোলায়।

রিণ্টু ভাবল-এই যা,! গেল বুঝি নিরীহ প্রাণী দুটো। রায়গিন্নীর ঐ সোহাগী বেড়াল এক্ষুনি হয়তো ছিঁড়েকুঁড়ে খাবে ওদের! ইস্! না, কখনোই হতে দেবে না রিণ্টু। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় একটা মজার কথা! শিমুলতলার বাড়িতে রাঙাদা'কে কতদিন দেখেছে হাততালি দিয়ে পায়রা উড়িয়ে দিতে। চটাচট্ হাততালি দিলেই পায়রারা কেমন চমকে ওঠে। হয়তো ভয় পায়। সঙ্গে সঙ্গে তাই ঝাঁক বেঁধে ডানা মেলে দেয় আকাশে।

রিণ্টু বুঝল—এই হচ্ছে ওদের বাঁচাবার একমাত্র উপায়। যেই ভাবা সেই করা। চটা চট্ আওয়াজ তুলে সজোরে হাততালি দেয় রিণ্টু। সেই মুহূর্তে ম্যাও-ম্যাও দেয় জোর লাফ।

এদিকে হাততালির আওয়াজে চমকে উঠেই—কিছু না বুঝেই পায়রা দুটো ঝট পট্ উড়ে যায়। সেই সঙ্গে ছাদের আর আর পায়রারাও। আর ম্যাও ম্যাও? আহা বেচারী! তাক্ কষে লাফ দেওয়াটাই তার ফস্‌কে যায়। শিকার ধরতে তো পারেই না—উল্টে, কার্নিশ টপ্‌কে, ছিট্‌কে গিয়ে পড়ে নিচের তলার বারান্দায়। ফলে সামনের একটা পা যায় বেমক্কা মুচ্‌কে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ককিয়ে ওঠে ম্যাও ম্যাও।

শয়তানটার দুরবস্থা দেখে ভারি মজা পায় রিণ্টু। তাই ওকে শোনাতে হাততালি দিতে দিতে চেঁচিয়ে ওঠে,—

ঠিক হয়েছে—বেশ হয়েছে—যেমন তুমি পাজি:
হাতে হাতেই দুষ্টুমিটার ফলটা পেলে আজি।

রিণ্টুর কথা শুনে ম্যাও ম্যাও কিছুই বলেনা। একবার শুধু করুণ চোখদুটো তুলে রিণ্টুর দিকে একটু তাকায়। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোথায় যেন চোখের আড়ালে সরে পড়ে।

রিণ্টু তখনো চ্যাঁচায়—

কেয়া মজা-ফুড়ুৎ হল বক্ বক্‌মের জোড়া—
মাঝের থেকে ম্যাও ম্যাও টার, ঠ্যাঙ্ হল খোঁড়া॥

এ মাসেও সন্দেশ বেরোতে দেরী হল। এক-একটা সন্দেশ ছাপতে ত মাসখানেক সময় লাগে। কাজেই একবার দেরী হয়ে গেলে আর সহজে সেটা ঠিক করে নেওয়া যায় না। বৈশাখ মাসের মধ্যে ঠিক করে নিতে চেষ্টা করছি। চৈত্রমাসের সন্দেশও তোমরা কয়েকদিন দেরীতে পাবে।

(১) অঞ্জন ভট্টাচার্য ২৩৬১, বয়স ১৩

শুনেইছো তো ব্রাণ্টালুসি দুর্ঘটনার লেখক হলেন শিশির মজুমদার। ওটা ছাপার ভুল। হ্যাঁ, ভাই, ছবি নীল কালিতেও চলবে। কিন্তু কুচি কুচি কাগজে ছবি এঁকে কেউ কেউ পাঠায়, তা কর না।

(২) তাপস শূর রায়, ২৯৫৫, বয়স ১১

'কবিতা স্যার' ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। লেখক অজেয় রায়ের বেশি বয়স নয়। তোমাদের কি ভালো লাগে না লাগে তাও যেমন জানেন, আবার তেমনি ফাঁকতালে তোমাদের অনেক চিত্তগ্রাহী নতুন বিষয় শিখিয়েও দেন।

(৩) শীলা সাহা,

না ভাই, ধাঁধাটি চলল না। তার কারণ যে বাদ্য-যন্ত্রের কথা লিখেছ, সেটি "বিনা" নয়, "বীণা"। আরো লিখতে থাকো।

(৪) অণুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১৮২৭, বয়স ১৬, ১৪

ভাদ্র আশ্বিন মিলে যে মোটা সংখ্যা বেরিয়েছিল, সেটিই মহালয়ার আগে বেরিয়েছিল, যাতে তোমরা পূজার ছুটিতে আনন্দ করে পড়তে পার। পরবর্তী সংখ্যাটিতে পূজার জন্য পাঠানো ও সংগৃহীত কয়েকটি ভালো লেখা বেরিয়েছিল, কাজেই ওকেও একটি বিশেষ সংখ্যা বলা চলে। এটিও একটু বড়-ই বলতে হবে। লেখা পাঠিও, ভালো হলে ছাপব, তবে কবে ছাপা হবে সেটা জায়গার উপর নির্ভর করছে।

(৫) লীনা, ১৯৩৮, পদবী কি, বয়স কত না দিলে কি করে উত্তর দিই ? তবে পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্যও খুসি হয়েছি বলা বাহুল্য।

(৬) মিত্রা রায়চৌধুরী ১৪২৫, বয়স ১৩½ তোমার শুভেচ্ছা পেয়ে আমরা খুসি।

(৭) সৌমিত্র সেনগুপ্ত, ২৮১৯, বয়স ১০ ছবি ভালো হলেই ছাপানো হবে। বাঁ হাতে কাজ কর লিখেছ, কিন্তু জানতো পৃথিবীর সব যন্ত্রপাতিই যারা ডান হাতে কাজ করে তাদের জন্য তৈরি। সঙ্গে সঙ্গে ডানহাতেও অভ্যাস কর।

(৮) চৈতালী সান্যাল, ২৬১২, বয়স দাওনি কেন?

(৯) নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঞ্জন, সমীর ও মিতালী গুহ ১৬০৩, বয়স ১৩, ১২, ১০, ৬।

তোমরা ছুটিতে বেড়িয়েছ শুনে খুসি হলাম। যেখানে যখনি যাবে সর্বদা দেখবার মতো কিছু থাকলে ভালো করে লক্ষ্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেউ দেখে না এমন ছোটখাটো জিনিস থেকেও অনেক সময় খুব মজা পাওয়া যায়।

(১০) অর্পিতা রায়চৌধুরী, ২৮৩৭, বয়স ১১ পূজার সন্দেশ ভাল লেগেছে শুনে যেমনি খুসি হলাম, মলাটের ছবি কেন অন্যান্য বইয়ের মতো চকচকে হয়নি, একথা শুনে তেমনি হতাশ হলাম। যখন হাতে সময় পাবে, একটু মন দিয়ে মলাটটাকে দেখো তো। যদি কিছু পাও।

(১১) শুভা বিশ্বাস, ২০২৯, বয়স ১৫

তোমাদের তিন বোনের কৃতিত্বের জন্য আমাদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু কৃতী হওয়ার আনন্দে যেন ব্রতী হতে ভুলে যেও না।

(১২) কুশল সেনগুপ্ত, ২৮৯৫, বয়স ৯½।

তোমার ধাঁধার উত্তর 'অপর পৃষ্ঠায় দেখুন' লিখেছ, কিন্তু অপর পৃষ্ঠায় তো দেখতে পেলাম না, ভাই। নতুন করে লিখে পাঠিও।

(১৩) শুভ্রা সান্যাল, ২৫৯৯, বয়স ১২।

অরু-মিতুর কথা আর ব্রাণ্টালুসি দুর্ঘটনা, দুটি দুরকমের গল্প, কিন্তু দুই-ই উপভোগ্য, এ-কথা সত্যি। কিন্তু ১২ বছর বয়স হল, এর মধ্যে মনে রাখার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নি, কাউকে দেখ নি, কোথাও যাও নি, তাই বা কি করে সম্ভব হতে পারে?

(১৪) সন্দীপন দেব, ২০৪০, বয়স ৭।

আগের লেখার কথা তো বলতে পারছি না, ভাই। ভালো হলেই ছাপাই। নতুনটা লিখে পাঠাও না কেন? খুব বেশি বুড়ো তো আর হও নি।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

রাসনা, নীলাঞ্জন আর আমি

জীবন সর্দার

বহুদিন আমার বন্ধু নীলাঞ্জনের খোঁজখবর না পেয়ে তাকে খুঁজতে তাদের গ্রামে গিয়েছিলাম।

আমগাছে নতুন পাতা হলে সে বছর তাতে আর মুকুল আসে না—কথাটা সত্যি কিনা তার কাছ থেকে শুনে তা' যাচাই করতে চেয়েছিলাম। তার ঘরে তার দেখা না পেয়ে, একটি চিঠিতে—'আমি এসেছিলাম' লিখে রেখে বেরিয়ে এলাম।

তাদের গ্রামের শেষে পথের ধারের বড় আমগাছটার তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখি মগডালে বসে নীলাঞ্জন একমনে কি দেখছে। আমি তাকে ডাকলুম। সে বললে, ভয় নেই উঠে এসো।

ডাল বেয়ে অনেক কষ্টে তার কাছে পৌঁছে দেখি আতস কাঁচ দিয়ে সে 'রাসনার' শেকড় দেখছে। বললে, আরও কিছুদিন আগে এলে এই অরকিডের ফুলগুলো দেখতে পেতে।

বললাম, অরকিড! সে তো হয় পাহাড়ে বনে। এখানে গ্রামের ভেতর সে জিনিস কেমন করে পেলে।

'রাসনা'ও একজাতের অরকিড, জান না বুঝি? শেকড় শুদ্ধু রাসনার একটি ডাল তুলে এনে আমার সামনে ধরে বললে, কি দেখছ?

বললাম, 'লম্বা লম্বা, পুরু সবুজ পাতায় একদম ঢাকা কোমল একটি কাণ্ড। পাতাগুলির গোড়া একটির উপর অন্যটি এমন করে ঢেকে আছে যার ফলে কাণ্ডটি দেখাই যাচ্ছে না।'—'এই যে শেকড়টি', আমার কথার মাঝখানেই সে বলতে শুরু করলে, 'এটি 'অবরোহ'—কাণ্ডের গা থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় দুলছে, হাওয়া থেকেই এটি জল শুষে নিতে পারে। গরম দেশের অরকিড মাত্রেই পরগাছা কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ দেশে মাটিতেও অরকিড হতে দেখবে।

তাই নাকি! রাসনা যে অরকিড কোনকালেই আমার মনে হয়নি। অরকিডের কথা শোনার জন্য তার পাশে ডালের উপর ভাল করে বসলাম। বললাম, 'এত কিছু দেখার রয়েছে, সব ফেলে গাছের ডালে বসে অরকিড দেখার ঝোঁক এলো কেন তোমার।'

'অরকিডের ফুল আমাকে আকর্ষণ করে। ফুলগুলোর রং, গড়ন এমন হঠাৎ দেখে মনে হয়

ওগুলো কোনজাতের মৌমাছি কিংবা প্রজাপতি। এই ধরণের ফুলের জন্যেই হয়তো একসময়ে দেশ-বিদেশে অরকিডের আদর বেড়ে গিয়েছিল। অরকিড জোগাড় করতে দূরদূরান্তে চলে যেত মানুষ। আমি তাকে থামিয়ে জিগগেস করলাম, 'দূরদূরান্ত থেকে সজীব অরকিড ফুল নিয়ে আসা কি করে সম্ভব হোতো? গাছ থেকে ফুল ঝরে যেত না'!

'ফুল যাক, গাছ নিশ্চয়ই থাকতো। 'রাসনার' মূল আর কাণ্ড দেখেই বুঝতে পারছ বাতাস থেকে জল শুষে বেশ কিছুদিন সে বেঁচে থাকবে'—নীলাঞ্জন বললে। 'রাসনার কথা বাদ দাও, আরও অনেক রকম অরকিড তুমি দেখতে পাবে আসাম আর হিমালয়ের জংগলে যাদের নরম কাণ্ড আলুর মত ডুমো ডুমো। যে অরকিড মাটিতে জন্মায় তাদের শেকড়গুলোও ঐ রকম। তাতে দূরদূরান্ত থেকে আনার সময় অরকিডের রসের জোগান বন্ধ হোতো না। কিন্তু ঘরে নিয়ে এলেই কাজ ফুরিয়ে যায়না, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বাড়িয়ে তুলতে হবে। তাতে ফোটা ফুল দেখতে হবে। ছায়ায় ঢাকা ঠাণ্ডা ভেজা ভেজা আবহাওয়ায় অরকিডগুলো হয় বেশি। তাই একটি ঘরের পরিবেশ এমন করতে হবে যেমনটি ছিল সেখানে যেখান থেকে গাছটিকে আনা হয়েছে'।

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই বললাম, 'বুঝেছি বুঝেছি, যেমনটি দেখেছি দার্জিলিংএর 'অরকিডহাউসে'। সেখানে আমি পঞ্চাশ ষাট ধরণের ফুলও দেখেছি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'সিপরিপেডিয়াম' আর 'সিমবিডিয়াম'-এর ফুলগুলি। ওগুলো মৌমাছির মত দেখতে। আর 'ওদোনতোগ্লসাম'-এর ফুলগুলি দেখে মনে হয়েছে একঝাঁক খুদে প্রজাপতি। নীলাঞ্জন খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিল। চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ আমার কথা শেষ হবার পরেও। তারপর বললে, 'অরকিড ফুল তুমি তা'হলে দেখেছ। কিন্তু ফুলে মাছিজাতীয় পোকাদের বসতে দেখেছ? আমি দেখেছি, রংগীন অরকিড ফুলের দিকে একটা মৌমাছি উড়ে এসে সবার নীচের বড় পাপড়িটায় গিয়ে বসলো। তার কাছে পাপড়িটা যেন বারান্দা, তার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেখানটায় 'মধু-গর্ত' সেদিকে এগিয়ে গেল। মধু-গর্তে মাথা ঢোকাতে যেতেই গর্তের উপরের ঠোঁটের মত ছোট্ট ঢাকনাটা পরাগরেণু সহ ভেংগে গিয়ে তার মাথায় জড়িয়ে গেল। মধু সে খেয়ে গেল কিন্তু মাথায় বয়ে নিয়ে গেল ফুলের রেণু। তারপর, যখন সেই মৌমাছিটা আর একটা ফুলে মধু খেতে গেল তখন তার মাথায় লাগা রেণুর সাথে ফুলটার রেণু মাখামাখি হয়ে গেল। ব্যাপারখানা দেখে আমার মনে হল, অরকিড ফুলের নমুনা বিশেষ অর্থে আর সব ফুল থেকে একদম আলাদা। আলাদা এই অর্থে, প্রায় সব অরকিড ফুলই রেণুবিনিময়ের জন্য মৌমাছিনির্ভর। প্রজাপতি ডানা সোজা তুলে বসে বলে 'মধু-ভাণ্ডের' কাছাকাছি এগোতে পারেনা, অন্য পাপড়িতে ডানা বাধা পায়। ছোট ছোট মাছিরাও মধু ভাণ্ডের উপরকার শুঁয়ো এড়িয়ে এগোতে পারে না। যে ফুলে যে ধরণের মৌমাছি এসে মধু খেতে পারে, দেখে মনে হয়, ফুলের গড়নই এমন যে তারই সুবিধা শুধু, অন্য জাতের মৌমাছির সাধ্য নেই সেটা থেকে মধু খায়। উল্টো ভাবেও ভেবেছি—যেমন, মৌমাছি গুলো এমন জাতের অরক্ষিত ফুলই বেছে নেয় যেটার গড়ন এমন যে তার নিজের গড়ন যাই হোক, মধু খেতে অসুবিধা হয়না।

মোটমাট বিশেষ ধরণের অরক্ষিত ফুল বিশেষ ধরণের মৌমাছির উপর নির্ভরশীল—পরাগ বিনিময়ের জন্য। তাতে দুয়েরই লাভ।'

নাবতে নাবতে বললে, 'একটা কাজ করবে'?

বললুম, 'কি'?

'এবার মার্চএপরিলে চলো পশ্চিমসিকিমে যাই। সেখানে নাকি অনেক জাতের অরকিড দেখা যায়। আমরা শুধু দেখব কেমন অরকিড ফুলে কেমন মৌমাছি আসে। কি রাজি'?

শেষ ডালটায় দোল খেয়ে মাটিতে নেমে বললাম, 'রাজি'!

প্রকৃতি পড়ুয়াদের মেঠো-খসড়া থেকে ঃ

(প্র, প, উজ্জ্বলকুমার চক্রবর্তী আর উৎপলকুমার চক্রবর্তী গত বর্ষায় দিনের পর দিন সূর্যাস্তের সময় মেঘ ও আকাশের রংফেরা লক্ষ্য করে লিখে রেখেছে। তাদের মেঠোখসড়া থেকে দু'দিনের)

২২শে শ্রাবণ ৭৬ঃ আজ সকাল থেকেই আকাশটা খুবই মেঘলা। বিকেলে দেখলাম পশ্চিমাকাশ একেবারে বাদল মেঘে লেপা। কোথাও হালকা ছাই রং কোথাও গাঢ়। সূর্যাস্ত কখন হয়ে গেল বুঝতে পারলুম না। আকাশের রংএর কোনও হেরফের নেই।

৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট) : আজ সূর্যাস্ত হলো ছ'টার আগে। আকাশ আজ পরিষ্কার। বাদল মেঘ কম। মেঘগুলো কিরকম ছাড়া-ছাড়া হাল্‌কা হয়ে অন্যান্য মেঘের তুলনায় অনেক নীচু দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এটা আজকের আকাশের একটা বিশেষত্ব। অবশ্য এই বিশেষত্বটা পশ্চিমাকাশের।

দুদিন বৃষ্টির পর আজ আকাশের রং দেখলাম। সূর্যাস্তের ঠিক পরেই সূর্যের জায়গাটিতে দারুণ ঘন হলুদের সঙ্গে একটু লাল রং মেশালে যে রং হয় সেই রং হয়েছে। রংএর ঘনত্ব অস্তবিন্দু থেকে যত দূরে ছড়িয়েছে তত রংটা ক্রমশঃ হাল্‌কা হচ্ছে। সূর্যের বাঁয়ে আর ডাইনে বহু দূরে গিয়ে রং ক্রমশঃ মিলিয়ে গেছে। আজ বাদল মেঘের অনেক পিছনে কয়েকটা সাদা মেঘ উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত অবস্থায় ছিল। সেগুলো সূর্যাস্তের পর সামান্য লাল মেশানো হলুদ হলুদ হয়ে গেল। ভেসে যাওয়া বাদল মেঘগুলো অস্তগামী সূর্যের কাছে আসতেই তাদের ওপর লালচে হয়ে উঠছে। এ সময়ে পুবের আকাশ লালচে। সময় যেতে যেতে রং কমে এলো। তারপর রং আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আকাশ থেকে।

[প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা প্রতি মাসের প্রথম রোববার সন্দেশ কার্যালয়ে এখন থেকে বিকেল চারটের বদলে বিকেল পাঁচটায়, মনে রেখ। জীঃ সঃ]

মরীচিকা

অজেয় রায়

(মাস্টার মশাই, বা প্রত্নতাত্ত্বিক রতনলাল রায় ফরাসী প্রাণিবিজ্ঞানী অঁদ্রে ফুশের সঙ্গে গোবি মরুভূমিতে ক্যাম্প ফেলে লুপ্ত সভ্যতা ও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অনুসন্ধান করছিলেন। একদিন দূর থেকে তিনি বালির উপর এক লামাকে পড়ে থাকতে দেখলেন—মঙ্গোলীয় গড়ন, মুণ্ডিত মস্তক পরনে বিবর্ণ লাল আলখাল্লা এবং পাশে কাপড়ের ঝুলি।)

॥ ২ ॥

আমি কাছে যেতেই সে একবার চোখ মেলে তাকাল। দৃষ্টি ঘোলাটে। কি যেন বলতে চাইল অস্ফুট স্বরে।

তারপরই মাথাটা কাত হয়ে হেলে পড়ল।

তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করে দেখি—না, প্রাণ আছে। মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। তবে নাড়ি খুব ক্ষীণ, দুর্বল।

তার মাথায় জলের ঝাপটা দিলাম। জল খাওয়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু জ্ঞান ফিরল না।

কি করি? একে এতটা পথ বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা নয়।

কিন্তু ক্যাম্পে গিয়ে লোক ডেকে আনব, তারপর নিয়ে যাব অনেক দেরি হয়ে যাবে যে। অতএব লোকটিকে কাঁধে তুললাম। তার ঝুলিটিও সঙ্গে নিলাম।

দেহটি ছোটখাট। হাল্কা। তবু সেই উঁচু নিচু পথে, পাথর আর বালির ওপর দিয়ে চলতে কষ্ট হচ্ছিল। মরুদ্যানে যখন পৌঁছলাম, রীতিমত হাঁপাচ্ছি। ক্যাম্পের লোকেরা দেখে দৌড়ে এল সাহায্য করতে।

আমার তাঁবুতে ক্যাম্পখাটে তাকে শোয়ানো হল।

অচেতন দেহ। গলা দিয়ে মাঝে মাঝে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা জল তার মুখের মধ্যে ঢেলে দিতে লাগলাম। মুখ, মাথা, ঘাড় মুছে দিলাম ঠাণ্ডা জলে। আরও নানারকম সেবাশুশ্রূষা চলল।

জ্ঞান হল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

কিন্তু ঘোর কাটেনি। কেমন আচ্ছন্ন ভাব। উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কণ্ঠস্বর বেরুচ্ছে না। হাত-পা নাড়ার শক্তি নেই।

সামান্য গরম দুধ খাওয়ালাম।

বিকেল থেকে এল প্রবল জ্বর। ভুল বকছে। ছটফট করছে।

নিজেই সাধ্যমত ওষুধ-পত্র দিলাম। কাজের খাতিরে অনেক সময় নানা অজানা দেশে মাসের পর মাস কাটাতে হত বলে নিজে কিছু কিছু ডাক্তারি শিখে রেখেছিলাম। সারারাত জেগে বসে রইলাম অসুস্থ লোকটির পাশে।

ভোর বেলা দেখলাম—জ্বর একটু কম। রোগী শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও বিশ্রাম নিতে গেলাম। সারারাত ঠায় জেগে বসে পিঠ টনটন করছে। চোখ টানছে।

বেলা চারটে অবধি সে অঘোরে ঘুমল।

জেগে উঠলে দুধ ও খানিকটা সুপ খেতে দিলাম। দেখে মনে হল অবস্থা অনেকটা ভাল। তবে জ্বর রয়েছে। খাটের পাশে একটা টুল টেনে বসলাম।

আমার মুখ পানে একটুক্ষণ চেয়ে সে হঠাৎ পরিষ্কার ইংরেজীতে বলে উঠল—আপনি কি ভারতীয়?

চমকে উঠলাম। এর মুখে ইংরেজী শুনব আশা করিনি। বললাম—হ্যাঁ।

—ঠিক বুঝেছি। সে ক্ষীণ স্বরে বলে।

—কি করে বুঝলেন?

—আমি ভারতীয় চিনি। ভারতবর্ষে যে ছিলাম অনেকদিন।

লোকটির সম্বন্ধে আমার কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল। বুঝলাম লোকটি শিক্ষিত। নেহাৎ হেঁজি-পেঁজি ভবঘুরে নয়। বললাম—আপনি কোথা থেকে আসছেন? মরুভূমিতে এ অবস্থায় পড়লেন কি করে?

লোকটি অল্পক্ষণ চোখ বুজে রইল। একটু দম নিল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল—আমার নাম চিম্-পো।

আমি একজন তিব্বতী লামা। লব-নোর থেকে তুন হোয়াংয়ের দিকে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে পথ হারাই। দু'দিন ধরে একফোঁটা জল পাইনি খেতে। মরেই যেতাম, আপনি বাঁচালেন। তথাগত বুদ্ধ আপনার মঙ্গল করুন।

—সে কি, লব-নোর থেকে আসছিলেন? একা! মরুভূমি পেরিয়ে, পায়ে হেঁটে? সে যে

ভীষণ বিপদজনক রাস্তা ?

লামা চিম পো নিঃশব্দে হাসল।

—পথের বিপদকে আমি ভয় পাই না। আর আমার মত নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর একা হাঁটা ছাড়া উপায় কি ? সব সময় সঙ্গী পাব কোথা ? গাড়ি-ঘোড়া-উট চড়ার পয়সা কৈ ? তা ছাড়া পায়ে হেঁটে ঘোরাই আমার লক্ষ্য। আমার তীর্থযাত্রা। কত দিন ধরে ঘুরছি। কত দেশ দেখলাম। বিপদেও কম পড়িনি। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের করুণা যার ওপর আছে, সে ঠিক রক্ষা পায়। যেমন এবারও বেঁচে গেলাম।

লামা আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইল।

দেখলাম অনেক কথা একসঙ্গে বলে তার কষ্ট হচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে।

বললাম—আপনি আর কথা বলবেন না। পরে শুনবো আপনার কাহিনী। এখন বিশ্রাম নিন। আমি বাইরে থাকছি। বিছানার পাশে এই কলিং বেলটা রাখলাম দরকার হলে বাজিয়ে ডাকবেন।

ফুশে তার দলবল নিয়ে ফিরল রাত দশটা নাগাদ।

আমার কাছে লামার বৃত্তান্ত শুনে সে তখুনি চলল তাকে দেখতে।

লামা চিম-পো বোধহয় চোখ বুজে শুয়েছিল। আমরা দু'জন তাঁবুতে ঢুকতে চোখ মেলল। আমার সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোককে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আমায় হাতজোড় করে নমস্কার জানাল। বুঝলান ভারতীয় রীতিনীতি সে জানে।

পরিচয় করিয়ে দিলাম—আমার বন্ধু অঁদ্রে ফুশে।

ফুশে লামাকে পরীক্ষা করল। চিকিৎসা বিদ্যায় সে আমার চেয়ে ঢের পটু। দেখে শুনে বলল, নাঃ ভয় নেই। জ্বরটা এসেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমএবং অত্যাচারের জন্য। তুমি ঠিক ওষুধই দিয়েছ। তবে আসল ওষুধ হচ্ছে ক'দিন কমপ্লিট্ রেস্ট। তাহলেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

রাতে তাঁবুর বাইরে খোলা আকাশের নিচে টেবিল চেয়ার—সাজিয়ে খেতে বসেছি। শুক্লপক্ষ চলছে ফট্ফটে জ্যোৎস্না। রুপোলী চাঁদের আলোয় মরুরাজ্য প্লাবিত। সে সৌন্দর্য কেমন জানি অপার্থিব, কেমন গা ছমছম করে।

আমাদের লোকজনরা কিছুদূরে আগুন জ্বেলে রাতের খাবারের আয়োজন করছে। ওরা জাতিতে চীনা এবং মঙ্গোল। তাদের হাসি ও গল্পের আওয়াজ ভেসে আসছে। ফুশের লোকেরা আমার দলের লোকদের কাছে তাদের গত দু'দিনের অভিযানের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করছিল। এরা খুব আড্ডাবাজ। আর গল্প করে বেশ খানিকটা রঙ চড়িয়ে।

আমরা খাচ্ছি তিনজন।

আমি, ফুশে এবং আমাদের সেক্রেটারী-কাম্-দোভাষী তান্চুং। তান্চুং জাতে চীনা। বছর পঁচিশ বয়স। মোটামুটি লেখাপড়া জানে। চালাক চতুর। মঙ্গোলিয়ার বিভিন্ন উপজাতিদের ধরন-ধারন, ভাষা খুব ভাল বোঝে। আমাদের লোকজন, খাবার, গাড়ি-ঘোড়া উট জোগাড় করা তাঁবু ফেলা

ইত্যাদি বন্দোবস্তর যাবতীয় ভার থাকে তার ওপর। সে নিপুণ ভাবে তার দায়িত্ব পালন করে।

তবে চুংয়ের একটি দোষ আছে। বড় হামবড়াই আর বাজে বকে। সব ব্যাপারে তার নাক গলানো স্বভাব। এ জন্য আমার কাছে প্রায়ই বকুনি খায়। ফলে আমায় সে কিঞ্চিৎ এড়িয়ে চলে। ফুশের কাছে আস্কারা পায়, তাই ফুশের সঙ্গে তার দহরম-মহরম। এবার ফুশের দলের সঙ্গে সে সার্ভেতে গিয়েছিল।

তবে ইদানীং ফুশেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

বার তিনেক ফুশের সঙ্গে ফিল্ডে গিয়েই চুং প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে লম্বা বুলি ঝাড়তে আরম্ভ করেছে। মাঝে মাঝে সে ফুশেকেও প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দিতে কসুর করে না।

খাবার টেবিলের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে লি। আমাদের রাঁধুনী, সে সজাগ ভাবে আমাদের খাওয়া লক্ষ্য করছে। দরকার মত এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। পরিবেশন করছে।

খেতে খেতে হঠাৎ চুং বলল—ঐ মাঙ্কটা আসছিল কোত্থেকে? যাচ্ছিলই বা কোথায়?

—তুন-হোয়াং যাচ্ছিল। আমি বলি। আসছিল লব-নোর থেকে।

—এঁ্যা। লব-নোর থেকে—বলেন কি? একা? পায়ে হেঁটে? পাগল নাকি লোকটা?

—তা জানিনা। আমি বললাম। তবে ও নাকি অনেকদিন ধরে দেশ বেড়াচ্ছে। একাই ঘুরছে, হেঁটে। বলল, তীর্থ করতে বেরিয়েছে।

—তা মরুভূমিতে একটা উট-টুট ভাড়া করলেও তো পারত। কিংবা কোনো ক্যারাভানের সঙ্গ ধরত।

—বোধহয় কোনো সাথী জোটেনি, তাই একলা আসছিল। আর উট ভাড়া করার ওঁর পয়সা নেই।

—তাই বলেছে বুঝি। শ্রেফ বাজে কথা।

লামাকে দেখে এবং তার কথাবার্তা শুনে আমার তাকে সৎ ও ধর্মপ্রাণ লোক বলে ধারণা হয়েছিল। তার সম্বন্ধে এমন কটু মন্তব্য করতে আমি চটে গেলাম। তানচুং নিজেকে ভাবে নব্য আধুনিক যুবক। সন্ন্যেসী টন্ন্যেসীতে তার ভক্তি নেই। কৌতূহলবশতঃ আমাদের পিছন পিছন গিয়ে একবার উঁকি মেরে লামাকে দেখেও এসেছে। কিন্তু তার স্বাস্থ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় নি। এখন আবার গায়ে পড়ে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে—

দৃঢ়স্বরে বললাম—প্রমাণ না পেয়ে কাউকে মিথ্যেবাদী বলা উচিত নয়। আমার বিশ্বাস সে সত্যি কথাই বলেছে। ওর চেহারা জামা-কাপড় দেখেই বোঝা যায় লোকটা কপর্দকহীন।

ফুঃ। চুং নাক দিয়ে একটা অবজ্ঞা সূচক শব্দ করে। ওদের চেহারা দেখা কিস্সু বোঝা যায় না। আমি জানি একটা সরাইখানায় এই রকম একজন মাঙ্ক হঠাৎ পটল তোলে। তাকেও দেখে মনে হয়েছিল হত দরিদ্র। তারপর তার ঝুলি থেকে কি বেরল জানেন?—গোছা গোছা নোট। দামী দামী পাথর। সোনারূপার মুদ্রা। জেড্ পাথরের কতগুলো পাত্র। প্রায় বিশ-হাজার টাকার সম্পত্তি।

একবার ওর থলিটা ঝেড়েই দেখুন না কিছু বেরোয় কি না।

—আমরা বাটপাড় নই যে ওর অজান্তে ওর ঝুলি হাতড়াব। ও যা বলেছে, আমাদের উচিত ভদ্রলোকের মতো তাই মেনে নেওয়া।

আমায় রাগতে দেখে চুং আপাততং চুপ করে গেল। কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হল সে নিঃসন্দেহ যে লামাটা ডাঁহা মিথ্যুক এবং ওর ঝুলি ঝাড়লেই সোনারূপো, নোট বৃষ্টি হবে।

সেদিন রাত্তিরে এক কাণ্ড ঘটল।

খাওয়ার পর ক্যাম্পে ঢুকেছি। আমার তাঁবুতে লামা রয়েছে, তাই ফুশের তাঁবুতে আমি একটা বিছানা পেতে নিয়েছি।

ফুশে আমায় কতগুলো টুকরো টুকরো হাড় দেখাচ্ছিল। ফসিল হাড়।

একটা মস্ত দাঁত—সেটাও জমে পাথর, হয়ে গেছে।

ফুশে বলল—এটা কোনো বিরাট প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর দাঁত। তবে প্রাণীটা কি তা ঠিক বলা যাচ্ছে না।

মধ্যএসিয়া এবং গোবি মরুভূমিতে এ যাবৎ কি কি প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে, তাদের চেহারা, স্বভাব চরিত্র কি রকম ছিল—তা নিয়ে ফুশে সবে মাত্র একখানা লেকচার শুরু করেছে এমন সময় কানে এল তুমুল হট্টগোল। উচ্চৈস্বরে কথাবার্তা, হৈচৈ চেঁচামেচি।

লাফ দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে এলাম।

প্রথমে মনে হল আমাদের লোকজনদের মধ্যে দু'দলে হাতাহাতি আরম্ভ হয়েছে।

দৌড়ে কাছে গিয়ে দেখি তা নয়—

মারামারির উপক্রম হয়েছে দু'জন লোকের মধ্যে। বাকিরা তাদের জাপটে ধরে আছে। লড়াই ঠেকাচ্ছে।

একজন আমাদের রাঁধুনী লি। অন্যজন উটচালক পো। লির হাতে ছোরা, পোর হাতে লাঠি। দু'জনেই সমান তড়পাচ্ছে।

—কি ব্যাপার?

শুনলাম লি আসল দোষী। সে পোর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিল। শোধ করছে না। আজ পো একটু কড়া ভাষায় তাগাদা দিতেই সে পোকে গালাগালি করতে থাকে।

ধার শোধ দেবার নাম নেই উল্টে গালিগালাজ করবে! স্বভাবতই পোর মেজাজত গরম হয়ে যায়। সেও দু'কথা শোনায়। তখন লি ফস্ করে ছুরি বের করে। মেরেই বসত, ভাগ্‌গিস অন্যেরা ধরে ফেলে।

লিকে নিয়ে এই এক ঝামেলা। ও যখন মাসখানেক আগে চাকরির জন্য আসে তখন নাম জিজ্ঞেস করতে সগর্বে বলেছিল—

—আজ্ঞে 'সুস্বাদু লি।'

—সে আবার কি ?

—আজ্ঞে ঐ নামেই আমায় লোকে ডাকে কিনা। আমার রান্নার গুণ।—

সত্যি তার রান্নার হাত ছিল অপূর্ব। সেই ধেধ্‌ধেরে গোবিন্দপুরে বসে মাঝে মাঝে কিসব রান্না খাওয়াত। আহা! শহরে খুব দামী হোটেলেও ওমন রান্না মেলে না। কিন্তু তার অন্য গুণগুলির পরিচয় ক্রমে পাওয়া গেল।

লোকটা দারুণ জুয়াড়ী এবং নেশাভাঙের অভ্যেস আছে। ফলে সর্বদাই ধার করে। তার বিরাট চেহারা এবং দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য অন্যরা বাধ্য হয়ে ভয়ে ধার দেয়। সে ধার শোধ করতে লির বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বরং ক্রমাগত আরও ধার নেবার চেষ্টা করছে। এই নিয়ে তার সঙ্গে অন্যদের প্রায়ই ঝগড়া বাঁধে। তবে এতটা বাড়াবাড়ি কোনদিন হয়নি।

ফুশে লিকে আচ্ছা করে ধমকাল।

—খবরদার, ফের যদি এমন বেয়াদপি দেখি তবে সেই মুহূর্তে তোমায় জবাব দেওয়া হবে। মনে রেখ।

ঋণদাতারা ধরল—আমাদের ধার শোধের একটা ব্যবস্থা করুন। আমরা গরিব মানুষ।

কার কাছে কত ধার তার একটা মোট হিসেব নিলাম। মোটা টাকা ধার। ঠিক হল লিকে তার প্রত্যেক সপ্তাহের মাইনে থেকে কিছু কিছু ধার শোধ দিতে হবে। ফুশে লিকে মাইনে দেবার সময় সে টাকা কেটে নেবে। তারপর নিজে হাতে পাওনাদারদের দেবে।

লি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন অবশ্য কোন উচ্চবাক্য করল না। তবে ব্যবস্থাটা মোটেই মনঃপুত হয় নি তার মুখ দেখেই মালুম হল।

দিন কয়েক পরে।

লামার তাঁবুতে ঢুকে আমি ও ফুশে দুটো টুল টেনে বিছানার পাশে বসলাম।

লামা শরীরে কিছুটা জোর পেয়েছে। আমাদের দেখে বিছানায় বালিসে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসল।

আমি বললাম—আপনার তীর্থযাত্রাকাহিনী শুনতে এসেছি। সেদিন বলছিলেন।

লামা চিম্‌পো বলল—সে কি আর তোড়জোড় করে বলার মতো। আপনারা পণ্ডিত। কত দেশ দেখেছেন। আমার অভিজ্ঞতা সামান্য।

—খুব সামান্য নয় তা আমরা বেশ বুঝেচি। ফুশে বলল। একা পায়ে হেঁটে গোবি পেরোবার দুঃসাহস খুই বেশি লোকের থাকে না। নাউ প্লিস্ স্টার্ট।

—বেশ তবে শুনুন। লামা মৃদু হাসল।

একটুক্ষণ চুপ করে ভাবল! তারপর বলতে আরম্ভ করল—

আগেই বলেছি আমি একজন লামা। আমার বাস ছিল তিব্বতের এক গুম্‌ফায়। এক সময় আমাদের গুহামন্দিরের বেশ নামডাক ছিল। ঘটা করে বুদ্ধের আরতি হত। অনেক লামা ও শিষ্যরা থাকত। কিন্তু একবার ভূমিকম্পে গুহাটার অনেকখানি অংশ ভেঙ্গে পড়ে। অন্যরা সেখান থেকে চলে যায়! মাত্র আমি এবং আমার এক শিষ্য গুম্‌ফার মায়া কাটাতে পারি না।

অল্প বয়স থেকেই আমার ইচ্ছে এসিয়ার প্রাচীনকালের বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি দেখব। ফা-হিয়ান, হিউয়েন্-সাং, ইৎসিং প্রভৃতি বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের লেখায় বহু প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘারাম, বিহারস্তূপের বর্ণনা পড়েছিলাম। অতীত বৌদ্ধজগতের পীঠস্থানগুলির গৌরবময় ছবি সর্বদা আমার কল্পনায় ভাসত! অবশ্য আজ তারা মৃত। অবশেষে মনস্থির করে ফেললাম। চলে গেলাম লাসায়।

সেখানে কয়েক বছর প্রাচীন ও আধুনিক কালের মানচিত্র পরীক্ষা করলাম। ভারতবর্ষ, চীন, দক্ষিণ পূর্ব-এসিয়া মধ্যএসিয়া প্রভৃতি যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সেখানকার বিখ্যাত প্রাচীন সংঘারামগুলির ভৌগোলিক অবস্থান এখন কোথায় হতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা করলাম। কোন্ রাস্তা দিয়ে, কোন কোন্ দেশের মধ্য দিয়ে যাওয়া যায় তা স্থির করলাম। কয়েকটা ভাষাও শিখে নিলাম ইংরেজী, চীনা, হিন্দী। প্রস্তুতি সমাপ্ত হলে এক দিন ঝুলি কাঁধে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

—কিন্তু সে সমস্ত প্রাচীন সংঘারাম, বিহারের ধ্বংসাবশেষ আপনি এখন দেখবেন কি করে? আমি প্রশ্ন করি। সেগুলির বেশির ভাগ এখন লুপ্ত, মাটির তলায়। অনেকগুলো ঠিক কোথায় যে ছিল তারই হদিস করা যায় নি!

—হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। লামা চিম্‌পো বলল। ভাবলাম যে কটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই, দেখব। যেখানে মাটির নীচে কবরে আজও কোনো সংঘারাম চাপা পড়ে লুকিয়ে আছে সেই যায়গাটি দেখাও তো পুণ্যকর্ম। তাই দেখি। ভ্রমণ কাহিনী পড়ে আমি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ সংঘারামগুলি কোথায় ছিল তা মোটা মুটি ঠিক করে নিয়েছিলাম।

তবে এ কথা সত্যি অনেক বড় বড় সংঘারামের বর্ণনা পড়েছি কিন্তু সেগুলো যে কোথায় ছিল তা আজ সঠিক জানাই যায় না। আমার ঝুলির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড মানচিত্র আছে 'আধুনিক এসিয়ার ম্যাপ। আমি নিজের হাতে এঁকেছি, যেখানে যেখানে যেতে চাই ম্যাপে দাগ দিয়ে নিয়েছিলাম।

প্রথমে নেপাল হয়ে ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে প্রবেশ করলাম। সমস্ত পূর্বভারত ঘুরলাম—আসাম বিহার, উড়িষ্যা বাংলা।

—আচ্ছা বাংলা দেশেও অনেক বৌদ্ধবিহার ছিল নাকি? দিলীপ গল্পের মাঝে হঠাৎ প্রশ্ন করে বলে।

নিশ্চয়ই! মাস্টারমশাই বললেন। হিউয়েন সাং বাংলায় সত্তরটি সঙ্ঘারাম বা বিহার দেখেছিলেন। তখন অবশ্য বঙ্গদেশের সীমানা ছিল অনেক বড়।

—কোনগুলো বিখ্যাত ছিল? সমর বলে।

সব চেয়ে নাম করা ছিল পো-চি-পো রক্তমৃত্তিকা, সোমপুরী জগদ্দল পিটিকোরক ইত্যাদি মহাবিহার।

—নালন্দার চেয়েও বিখ্যাত? দিলীপ বলে।

—না। মগধের নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারত কেন, সারা এসিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধবিহার। তার সঙ্গে কিছুর তুলনা হয়না। তবে মগধ অর্থাৎ এখনকার বিহার প্রদেশে অবস্থিত অন্যান্য বিখ্যাত বিহার, যেমন বিক্রমশীল বা ওদন্তপুরীর তুলনীয় বৌদ্ধমঠ বাংলাদেশে ছিল।

হ্যাঁ, তারপর শোন, লামা চিম্-পো বলল—

পূর্বভারত ভ্রমণ করলাম। নালন্দা দেখেছি। সেই বিরাট ধ্বংসাবশেষের কক্ষে কক্ষে সাতদিন ধরে ঘুরেছি। কল্পনা করেছি, হয়তো বহুজন্ম পূর্বে আমিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আচার্য শীলভদ্রের

পায়ের কাছে বসে শাস্ত্র শিখেছি। তথাগতের পুণ্যস্মৃতিজড়িত রাজগৃহ, বুদ্ধগয়ার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছে।

তারপর গেলাম বর্মা। মনিপুর হয়ে উত্তরবর্মার পথে। কিন্তু সে পথ তো ভীষণ দুর্গম। শুধু জঙ্গল আর পাহাড়। ফুশে বলল।

—পথ খুব খারাপ। অনেকবার বিপদেও পড়েছি।

বর্মা থেকে যাই কম্বোডিয়া। ওঙ্কাটভাট দেখতে। গভীর বনের মধ্যে ওঙ্কার-ভাটের পরিত্যক্ত মন্দির। পাথরে তৈরি। কি বিশাল! একদিন খমেরা এই মন্দির গড়েছিল। সেখানে বিরাট আকারের বুদ্ধ ও মহাকাল শিবের মূর্তি দেখলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়।

তারপর যাই—যবদ্বীপ। জাভা। বরোবুদর দেখতে।—হেঁটে নাকি? ফুশে দুষ্টুমিভরা সুরে প্রশ্ন করে।

—আজ্ঞে না। জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা আমার নেই। গেলাম জাহাজে। আমি কিছু টোটকা জানি। এক জাহাজী মেটের মাথার যন্ত্রণা সারিয়ে দিই। বছর খানেক ধরে তার সেই মাথাধরা সারছিল না। সে আমাকে তাদের জাহাজে একটা কাজ জোগাড় করে দেয়। জাভা থেকে সোজা ফিরে আসি সিংহলে, অন্য এক জাহাজে।

সিংহল থেকে আবার এলাম ভারতে। দক্ষিণ, পশ্চিম, মধ্য ভারত ঘুরে পৌঁছলাম কাশ্মীরে। ছবিতে অজন্তাইলোরা দেখেছিলাম। নিজের চোখে সেই অপূর্ব শিল্প দেখে জীবন সার্থক হল।

কাশ্মীর থেকে যাই আফগানিস্তান। সেখানে একদা ছিল বিখ্যাত তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। আরও অনেক বৌদ্ধবিহার। দেখলাম তক্ষশিলা এবং আরও কিছু কিছু লুপ্ত বিহারের কংকাল এখন মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। এই অবধি এসে আমার ভারতবর্ষ দেখা শেষ হল। ইতিমধ্যে আট বছর কেটে গেছে পথে পথে।

—আট বছর? সুনীল আশ্চর্য হয়ে বলে।

—তাতো হবেই। পায়ে হেঁটে ঘুরেছ কিনা।

—আচ্ছা মাস্টারমশাই, আফগানিস্তান কি ভারতের মধ্যে ছিল? সমর প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, প্রাচীনকালে আফগানিস্তানকে মোটামুটি ভারতের মধ্যেই ধরা হত।

তারপর শোন, লামা বলল—আফগানিস্তানে সব চেয়ে আশ্চর্য হয়েছি বামিয়েনের বৌদ্ধ গুহামন্দির দেখে। ভেঙেচুরে গেছে, জন-প্রাণী থাকে না। গুহার ভিতরে ঢুকে দেখেছি, দেয়ালে দেয়ালে সুন্দর ছবি আঁকা। আর বাইরে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট বুদ্ধমূর্তি। পাহাড়ের ধার কেটে তৈরি। কি ভীষণ উঁচু। কোনো কোনোটা একশো-দেড়শো ফুট হবে।

বামিয়েন থেকে নানা গিরিপথ ধরে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আমি মধ্য এসিয়ায় ঢুকলাম।

—কি, বিরক্ত লাগছে বোধ হয়? লামা হঠাৎ আমাদের মুখপানে চেয়ে বলে। একঘেঁয়ে পথযাত্রার কাহিনী শোনাচ্ছি? এবার আমি শেষ করছি।

—না না সেকি! দারুণ ইন্টারেস্টিং। আমরা দু'জনেই সরবে জানাই।

তবে লামার মুখচোখ দেখে মনে হল একটানা কথা বলে সে ক্লান্তি অনুভব করছে। তাই বোধ হয় থামতে চায়।

—গিরিপথ এবং উপত্যকার ভিতর দিয়ে পথ চলে কাশগর অবধি আসতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। পথে সঙ্গীও পেয়েছিলাম। সমস্ত পথে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন বৌদ্ধজগতের অজস্র স্মৃতি চিহ্ন।

কাশগর থেকে দক্ষিণবাহী বাণিজ্যপথ ধরি। ইয়ারকন্দ, খোটান হয়ে নিয়া অবধি এলাম। এ সব দেশ এক সময় সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল ছিল। এখন দেখলাম হতগৌরব।

নিয়া থেকে পুবমুখো যেতে আরম্ভ হল মরুভূমি—

মাইলের পর মাইলব্যাপী কখনো বালির সমুদ্র, কখনো রুক্ষ পাথুরে প্রান্তর। আমার লক্ষ্য মরুশহর তুন হোয়াং। সহস্রবুদ্ধের গুহা।

সহস্রবুদ্ধের গুহা? অদ্ভুত নাম! সুনীল বলে।

মাস্টারমশাই বললেন—হ্যাঁ নামটার কারণ আছে। এই ম্যাপে দেখ—

মাস্টারমশাই লম্বা লাঠিটা তুলে নিলেন—এই হচ্ছে ইউ-মেনকোয়ান গিরিপথ, সেখানে উত্তর আর দক্ষিণ রেশম পথ এসে মিশেছে। তার কাছেই এই ফুটকিটা হল—তুন-হোয়াং। একটা বড় মরুদ্যান। ছোটখাট শহর বলতে পার।

তুন-হোয়াং-এর কাছে পাহাড়ের গায়ে অজস্র গুহা আছে। এদেরই নাম চিয়েন-ফো-তোং অর্থাৎ সহস্র বুদ্ধের গুহা। এগুলি ছিল বৌদ্ধ গুহামন্দির। এক সময় নাকি এক হাজার বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল গুহাগুলিতে। সহস্রবুদ্ধের গুহা ছিল মধ্যএসিয়ার বৌদ্ধধর্মচর্চার এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। গুহাগুলির দেয়ালে আঁকা হয়েছিল অপূর্ব সব ছবি, বুদ্ধের জীবনী অবলম্বন করে। এককালে অজন্তার নকলে সহস্রবুদ্ধ, বামিয়েন ইত্যাদি গুহামন্দিরগুলি তৈরি হয়।

লামা বলল—আমি একা নই। একদল ব্যবসায়ীর সঙ্গ ধরেছিলাম। কিন্তু দলছাড়া হলাম নিজের বোকামিতে।

লব-নোরে কাছে আসতে আমার খেয়াল চাপল, মিরানে প্রাচীন বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠানের ধ্বংসস্তূপ দেখব।

আমাদের ক্যারাভান পথের পাশে তাঁবু ফেলেছিল। কথা হল আমি একদিনের মধ্যে ফিরে আসব।

কিন্তু পারলাম না। ঝড় উঠল—আঁধি। দিকভ্রম হয়ে ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল। এসে দেখি সবাই এগিয়ে গেছে। আমার মতো নগণ্য এক সন্ন্যাসীর জন্যে তারা সময় নষ্ট করবে কেন? যাবার সময় রেখে গেছে কিছু খাবার ও জল। যদি ফিরে আসি।

এবার আমি সম্পূর্ণ একা। চারপাশে যেদিকে চোখ যায় জনহীন মরুরাজ্য। কোথাও প্রাণের কোনো আভাস অবধি নেই। বাণিজ্যপথ ধরে আন্দাজে এগিয়ে চলি—

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝলাম পথ ভুল করেছি। এ রাস্তায় কোনো মানুষ পশু বা গাড়ি চলার চিহ্ন নেই। ক্রমে সামান্য খাদ্য ও জলটুকু ফুরিয়ে গেল। দিশাহারার মতো ঘুরেছি। ক'দিন ঘুরেছি? কোথায় গেছি? হুঁস নেই।—তারপরের ইতিহাস তো আপনারাই ভাল জানেন। লামা চিম্‌পো তার দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী শেষ করল। কথা বলার শ্রান্তিতে তার চোখ বুজে এল।

লামা চিম্‌পো তার গল্প বলেছিল তিন ঘণ্টার ওপর। মাস্টার মশাই বললেন। আজ সময় কম। তাই সে কোথায় কোথায়, কি কি দেখেছিল, সে সব খুঁটিনাটি অনেক বাদ দিয়ে গেলাম। অন্য কোনোদিন শোনাবো।

সেদিন বাইরে প্রকাণ্ড গোল চাঁদ উঠেছিল। বোধহয় পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নাধোয়া মরুপ্রান্তর। আমরা দু'জনে স্তব্ধ হয়ে রহস্যময় প্রকৃতির পানে চেয়ে অনেকক্ষণ বাইরে বসে রইলাম। গল্পের রেশ তখনও কাটেনি। হঠাৎ ফুশে বলে ওঠে—রয়, কি বিচিত্র জীবন! নেহাৎ লোকটাকে স্বচক্ষে দেখলাম। সামনে বসে শুনলাম, নইলে এ কাহিনী অন্য কারো মুখে শুনলে ভাবতাম, বানানো। উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।

এরপর থেকে প্রায়ই আমরা লামার কাছে গিয়ে বসতাম গল্প শুনতে। কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। লামা আমাকে ডাকত বাবুজী। ফুশেকে—সাহেব। কথা বলত কখনো ইংরেজীতে কখনো হিন্দীতে। অসুবিধা নেই ফুশে হিন্দী বোঝে।

ফুশে বলত—রয় ও কিন্তু তোমাকে বেশী ফেভার করে। দেখেছো, তোমায় দেখলে ওর চোখ-মুখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কথাটা মিথ্যে নয়। আমার ওপর লামার বিশেষ স্নেহ জন্মেছিল।

লামার কাছে শোনা দু'একটা গল্প আজও মনে আছে।

একবার আরাকানের জঙ্গলে লামা হাতির পালের সামনে পড়ে। সে কাঠের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সেই বিরাট প্রাণীগুলি তার চারপাশে চরে বেড়ায়। মট্‌মট্ করে ডাল ভাঙে। কিন্তু তাকে কিছু বলে না। যেন দেখতেই পায়নি। ধীরে ধীরে তারা দূরে চলে যায়।

হিন্দুকুশ পর্বতের উপত্যকায় সে ডাকাতের হাতে পড়েছিল। তার কাছে মূল্যবান কিছু না পেয়ে ডাকাতরা চটেমটে লামাকে ক্রীতদাস করে রাখে। লামাকে দিয়ে তারা জল তোলাতো, বাসন মাজাতো—খুব খাটাতো। একদিন আর একদল ডাকাতের সঙ্গে সেই দলের লড়াই হল। ফলে তাদের দলের একজন বন্দুকের গুলিতে ভীষণ জখম হয়। লামা-চিম্-পো আহতকে দিনরাত্রি শুশ্রূষা করে তার প্রাণ বাঁচায়। ডাকাতরা তখন অনুতপ্ত হয়। বারবার ক্ষমা চেয়ে তাকে মুক্ত করে দেয়। যাবার সময় সঙ্গে দেয় প্রচুর খাবার-দাবার। টাকাকড়িও দিতে চেয়েছিল, লামা নেয় নি।

লব-নোরের কাছে লামা নাকি ভূতের খপ্পরে পড়ে। তার চারধারে সারাদিন জীন-পরীরা বাজনা বাজায়। গান গায়। হাসি-কান্না দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শোনে। তখন সে একমনে ভগবান বুদ্ধের নাম জপতে শুরু করে। প্রভু রক্ষা কর এই মায়াজাল থেকে।

আস্তে আস্তে বিপদ কেটে যায়। অশরীরীরা দূরে সরে যায়। সব শান্ত হয়।

—সত্যি সত্যি মরুভূমিতে ভূতটুত আছে নাকি? প্রশ্নটা করে সুনীল কিন্তু অন্য দু'জনের চোখেও ঐ এক জিজ্ঞাসা।

—আরে না না। ওর বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। মাস্টার মশাই বলেন। বাতাসের ঘায়ে বালির স্তূপ ধ্বসে পড়ে অনেক অদ্ভুত আওয়াজ সৃষ্টি হয়। নানা রকম সুরেলা শব্দ। মনে হয় যেন হাসি-কান্না, বাজনা শুনছি।

—লামার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল। অধিকাংশ সময় সে বিছানায় বসে থাকে, তবে তখনও ভাল হাঁটা চলা করতে পারে না। কারণ পায়ের তলায় ক্ষত। চলতে চলতে তার জুতো ছিঁড়ে যায়। খালি পায়ে গরম বালির ওপর দিয়ে হেঁটে পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়েছিল। তাই থেকে—যা।

—লামা প্রায় আমার গবেষণার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করত। জানতে চাইত। একদিন বলেছিল—বাবুজী, এত দূর দেশে এসেছেন। এই দেশের প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করছেন কিন্তু নিজের দেশে কাজ করেন না কেন? সেখানেও তো কত পুরনো মূল্যবান ইতিহাস মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে।

বললাম—কথাটা ঠিক। তবে মধ্যএসিয়ার ইতিহাস আবিষ্কার করলে ভারতেরও অনেক প্রাচীন ইতিহাস জানা যাবে। আপনি তো জানেন এককালে ভারতের সঙ্গে মধ্যএশিয়ার কত যোগাযোগ ছিল। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম শিল্পরীতি এখানে প্রভাব বিস্তার করে। অনেক ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত এখানকার রাজ্যগুলিতে এসেছিলেন। মধ্য এসিয়ার ধ্বংসস্তূপে অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় লেখা। সে সব ভাষা

এখন লুপ্ত। এমন কি ভারতেও তাদের নমুনা পাওয়া যায় না! কাজেই এখানে বসে আমি ভারতবর্ষেরই প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করছি মনে করতে পারেন।

—লামা মাথা নেড়ে সায় দেয়—ঠিক বলেছেন। খাঁটি সত্যি কথা। এ কাজ আরও কঠিন।

সে কিছুক্ষণ নিজের মনে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল, তারপর—মাথা তুলে বলল,—বাবুজী আমার কাছে একটা জিনিস আছে, এক মহামূল্যবান সম্পদ। আমার আর এটা কিসের দরকার? কেন মিছে এই ভার বহন করে বেড়াই? বরং এ বস্তু আপনার হাতে পড়লে তার উপযুক্ত ব্যবহার হবে। আপনিও লাভবান হবেন। আপনি আমার প্রাণ দিয়েছেন, ঋণশোধ আপনার পাওনা আছে। কি—ন—তু। আচ্ছা এখন থাক্। আর—কটা—দিন ভাবি। নিজের মনকে বোঝাই, তারপর যা হয় কর্তব্য স্থির করব।

ছ্যাঁৎ করে উঠল মনটা। সত্যি কোনো দামী পাথর-টাথর আছে নাকি ওর সঙ্গে?

যাক্, এ নিয়ে আমি আর কথা বাড়ালাম না। কাউকে কিছু বললামও না। জানলে চুং নির্ঘাৎ লামার ঝুলি হাঁটকাবে।

—ফুশে সার্ভেতে বেরল।

—লম্বা ট্যুর। ফিরল তিনদিন পরে। এসেই আমায় জড়িয়ে ধরল—রয়, আমার বরাত খুলে গেছে। কি পেয়েছি দেখবে?

ফুশে প্যাকিং খুলে বের করল একটা মস্ত ডিমের ভাঙ্গা খোলা। জমে শক্ত পাথর হয়ে গেছে!

—এত বড় ডিম! কোন পাখির?

—হোপলেস্। পাখি ছাড়া-বুঝি কেউ ডিম পাড়ে না? কোন পাখির ডিম নয়। এটা হচ্ছে সরীসৃপের ডিম। ডাইনোসরের! কোটি কোটি বছরের পুরনো।

—এ্যাঁ, বল কি হে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখলাম খোলাটা। বললাম—

—তুমিই প্রথম পেলে নাকি এ বস্তু?

—না আগেও পাওয়া গেছে। ফুশে বলে। বৈজ্ঞানিকরা এ পর্যন্ত পৃথিবীকে কেবল মাত্র এই গোবি অঞ্চলেই ডাইনোসরের ফসিল-ডিম পেয়েছেন। তবে মাত্র কয়েকটি।

আরো আছে। দেখো—

ফুশে বের করল কয়েকটা ছোটবড় ফসিল। কংকালের অংশ।—এইটে হচ্ছে চোয়ালের হাড়। কিসের জান? খুব সম্ভব বেলুচিথেরিয়ামের। এরা ছিল ডাঙ্গার বৃহত্তম প্রাণী। স্তন্যপায়ী জন্তু। গণ্ডারমার্কা চেহারা, আর হাতির কয়েকগুণ বড় সাইজ। আশ্চর্য, উপত্যকাটা কেন যে এত দিন আমার চোখে পড়েনি? অথচ ধারে কাছে ঘুরেছি।

—ডাঙ্গার সব চাইতে বড় জন্তু? আমি বলি। কেন? সেই যে বিশাল, ডাইনোসরদের ছবি দেখেছি। দৈত্যের মতো চেহারা। উঁচু উঁচু গাছের ডগা থেকে পাতা খাচ্ছে। তাদের চেয়েও বড়? কি জানি সব নাম—ডিপ্লোডকাস্, ব্রন্টোসরাস্—ভাল মনে নেই!

ফুশো বলল—খুব বিরাট ডাইনোসর, ডিপ্লোডকাস্ বা ব্রন্টোসরাস্ বেলুচিথেরিয়ামের চেয়ে আকারে বড় ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের ঠিক ডাঙ্গার প্রাণী বলতে পারি না। কারণ তারা থাকত জলাভূমিতে।

শুকনো ডাঙ্গায় স্তন্যপায়ী বেলুচিথেরিয়ামকেই সব চেয়ে বড় জন্তু বলা যায়।

ফুশে মহাখুশি হয়ে বলল—দেখ রয়। তোমার লামা কিন্তু দারুণ পয়া। এদ্দিন ধরে খুঁজেছি। কৈ তেমন কিস্মুতো মেলে নি। আর ও আসতে না আসতেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক কবরখানা আবিষ্কার করে ফেললাম! ওকে খবরদার ছেড়না। ভাল করে যত্ন-আত্তি করে আটকে রাখ। বলা যায় না, ওর কৃপায় হয়তো একটা আস্ত বেলুচিথেরিয়াম পেয়ে যেতে পারি।

—জীবিত না মৃত? আমি গম্ভীর গলায় বলি।

—মৃত। মৃত পেলেই আমি বর্তে যাই। জ্যান্ত বেলুচির মুখোমুখি হতে আমার কোনো বাসনা নেই। সেই দিনই আমার দলের লোক সব ভাগবে।

আমি বললাম—লামাকে আটকে রাখার কথা বলছো বটে কিন্তু জানি তা সম্ভব নয়।

—কেন?

—ওর হাব-ভাব দেখে আমি বুঝেছি ও ভিতরে ভিতরে বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। পা সেরে গেলেই ও রওনা দেবে। আসলে কি জান, পথ চলার নেশা ওকে পেয়ে বসেছে। ভবঘুরেমি ওর রক্তে প্রবেশ করেছে। সেদিন আমায় কি বলছিল জান—

বাবুজী চিয়েন-ফো-তোং দেখে দেশে ফেরার ইচ্ছে আছে! কিন্তু দেশে বেশিদিন থাকতে পারব কিনা জানি না। চুপচাপ এক জায়গায় বাস করতে আমার আর আজকাল মন চায় না। পথ আমায় টানে। মনে হয় কেবল ঘুরি। নতুন নতুন দেশ দেখে বেড়াই।

চার-পাঁচ দিন কেটে গেছে। লামা এখন হাঁটতে চলতে পারে। তার সঙ্গে আমাদের গল্প হয় সন্ধ্যের পর, কাজের শেষে ফিরে।

সেদিন সবে মাত্র আমরা ফিরেছি। হঠাৎ শুনি—বাবুজী। তাঁবুর দরজায় লামার গলা।

বিস্মিত হলাম। কারণ লামা কখনো আমাদের তাঁবুতে আসত না! আমরাই সুযোগ মতো তার কাছে যেতাম।

—আসুন আসুন, ভিতরে আসুন। দু'জনে অভ্যর্থনা জানালাম তাকে।

—লামা একটা চেয়ার টেনে বসল। বলল—আপনাদের একটা জিনিস দেখাব বলে আজ অপেক্ষা করছিলাম। তাই নিয়েই চলে এলাম।

—বেশ করেছেন। বেশ করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য। দেখান আপনার জিনিস। ফুশে বলল।

আমার হৃৎপিণ্ডটা কিন্তু উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছে। নিশ্চয় সেই দামী জিনিসটা। যার ইঙ্গিত ও একদিন দিয়েছিল।

আমাদের আগ্রহ-ভরা দু'জোড়া চক্ষুর সামনে লামা তার জোব্বার কয়েকটা বোতাম খুলে ফেলে। তারপর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আগে—একটা লম্বা চ্যাপ্টা কাঠের বাক্স। অতি সাধারণ বাক্স। কারুকার্যহীন।

কিন্তু ওর মধ্যে কি আছে? কোন্ অমূল্য নিধি? যা সে এত যত্নে লুকিয়ে রেখেছিল।

—লামা বাক্সের ঢাকনাটা খুলল। দেখলাম খুব প্রাচীন লম্বা লম্বা তালপাতার ওপর কালি দিয়ে লেখা। ধুততেরি মনটা একটু দমে গেল। কোথায় আশা করেছিলাম মণি-মুক্তো বা কোনো দামী পাথরের মূর্তি। তার

বদলে কি না এই!

—লামা পুঁথিগুলি সাবধানে বের করে টেবিলের ওপর রাখল। আট-দশটি পাতা। অক্ষর- সংস্কৃত।

এ পুঁথি কার জানেন? লামা বলল। তার গলা কাঁপছে। চিরশান্ত লামাকে এমন উত্তেজিত দেখে অবাক হলাম।

—কার?

—পণ্ডিতকুলশিরোমনি আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের। তাঁর নিজের হাতে লেখা।

—এ্যাঁ। আমরা একেবারে হতভম্ভ। বিশেষত আমি। চমকটা এ ভাবে আসবে কল্পনাও করিনি।

—প্রমাণ কি? কোত্থেকে পেয়েছেন এ পুঁথি? আমি উত্তেজিত হয়ে বলি।

—এ পুঁথি ছিল আমাদের গুম্ফায় এক গোপন কুঠুরির মধ্যে। আমিই আবিষ্কার করি। কে পুঁথিটা সেখানে এনেছিল? কবে এনেছিল? জানি না। পুঁথি আমি আর কাউকে দেখাই নি। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের হাতে লেখা। এই পরমপবিত্র স্মৃতি চিহ্ন আমি সযত্নে নিজে কাছে রেখে দিই।

—কি করে জানলেন এ লেখা দীপঙ্করের? ফুশে বলে।

—এই দেখুন নাম। শেষ পাতার নিচে স্বাক্ষর। —পুঁথির রচয়িতা আচার্য অতীশ দীপঙ্কর।

—আমি দীপঙ্করের হাতের লেখার নমুনা জোগাড় করেছিলাম। মিলিয়ে দেখেছি—হস্তাক্ষর হুবহু এক।

—পুঁথিটা তো আপনি পড়েছেন, এর বিষয়টা কি? কোনো শাস্ত্র-গ্রন্থ নাকি?

—না। উপদেশাবলী। ক-দং-প সম্প্রদায়ের আচার আচরণ সম্বন্ধে অতীশ কিছু উপদেশ দিয়েছেন। এই পুঁথিটি কোনা পুরো গ্রন্থ নয়। কোনো গ্রন্থের অংশ—একটি অধ্যায় মাত্র। আমি অন্যান্য অংশের জন্য তিব্বতে অনেক খুঁজেছি। অনেক গুম্ফায়, অনেক সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটেছি কিন্তু অন্য কোনো অধ্যায়ের সন্ধান পাইনি। হয়তো বাকি অংশগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কি কোন অনুবাদও আমার চোখে পড়ে নি।

—সুনীল বলল—ক-দং-প কি মাষ্টার মশাই?

—এক তিব্বতী বৌদ্ধসম্প্রদায়। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সৃষ্টি। দীপঙ্করের জীবনী তোমরা জানতো?

—'জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।' অমর সত্যেন দত্ত আওড়ায়।

—রাইট্। দীপঙ্কর বাঙ্গলার গৌরব। তিব্বতে ধর্মপ্রচার ওঁর এক মহৎ কীর্তি। তিনি ছিলেন রাজপুত্র। আগের নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। অল্পবয়সে জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ঘর ছাড়েন। নানা গুরুর কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং অবশেষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। নতুন নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। কেউ ডাকেন অতীশ দীপঙ্কর। চতুর্দিকে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। গৌড়ের রাজা মহীপালের আমন্ত্রণে তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারে যোগ দেন। এবং ক্রমে তিনি আচার্যপদ লাভ করেন।

দীপঙ্কর তখন বিক্রমশীলের প্রধান আচার্য। তিব্বতের রাজা লা-লামা-জেসে এবং তার পরের রাজা চানচুব বার বার দূত পাঠান তাঁকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানিয়ে। তিব্বতে কলুষিত, বিকৃত বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করতে দীপঙ্করের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি তখন বৌদ্ধজগতে কেউ নেই। ক্রমাগত সবিনয় অনুরোধে অবশেষে দীপঙ্কর রাজি হল। ১০৪০/৪২ খ্রীষ্টাব্দে, প্রায় ষাট-বাষট্টি বছর বয়সে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন। আর তিনি দেশে ফিরতে পারেন নি। প্রায় তিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি তিব্বতেই দেহত্যাগ করেন। তাঁর চেষ্টায় সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার হয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ক-দং-প নামে এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় তৈরি করেন।

—আমি ও ফুশে গভীর আগ্রহে পুঁথির ওপর ঝুঁকে পড়লাম।

হঠাৎ তাঁবুর পরদাটা নড়ে ওঠে।

—কে?

—আজ্ঞে আমি লি, আপনাদের কফি এনেছি।

তাইতো, মশগুল হয়ে এতক্ষণ আমাদের সান্ধ্য কফির কথা ভুলে রয়েছি।

—এস, ভিতরে দিয়ে যাও।

লি কফির ট্রেটা টুলের ওপর নামিয়ে রেখে চলে যায়।

পুঁথি পড়তে চেষ্টা করি—

সংস্কৃত ভাষা। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর। কোথাও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পাতাগুলি জীর্ণ মুড়মুড়ে। হাত দিতে ভয়, ভেঙ্গে যাবে। কয়েকটি পাতা ভাঙ্গা। লামা বলল ডাকাতদের কীর্তি।

তারা সার্চ করে বাক্সটা বের করে। ভিতরে মণি-মাণিক্যের বদলে কতগুলো বাজে লেখা দেখে চটে পাতাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে এই অবস্থা।

অনেক কষ্টে কয়েক লাইন পড়লাম। ভাল মানে বুঝতে পারলাম না। আমাদের সংস্কৃত জ্ঞান মন্দ নয়—রীতিমত খটমট।

তাঁবুর দোরগোড়ায় পায়ের শব্দ।

পরদা সরিয়ে তান্-চুংয়ের মুখ উঁকি মারল।

এ মুহূর্তে এই লোকটির উপস্থিতি সব চেয়ে অবাঞ্ছিত। বললাম—কি চাই?

তান্-চুং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে টেবিলের দিকে চাইল। তারপর বলল—একজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। খুব পেটের যন্ত্রণা। আপনারা কেউ আসুন।

—ঠিক আছে যাচ্ছি। তুমি যাও, ফুশে বলল।

তান্-চুং কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখ সরিয়ে নিল না। তির্যক-চোখে আর এক দফা পুঁথি পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে বলল—তাড়াতাড়ি আসুন স্যার। বড্ড কাতর হয়ে পড়েছে।

—চল। ফুশে ওষুধের বাক্স নিয়ে তানচুংয়ের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ফিরল মিনিট দশেক পরে।

আবার কিছুক্ষণ পুঁথি পরীক্ষা চলে। কঠিন কর্ম। সাত-তাড়াতাড়ি হবে না। যত্ন নিয়ে ধৈর্য ধরে পড়তে হবে।

লামা এতক্ষণ যেন ধ্যানমগ্নের মতো বসে ছিল। হঠাৎ ধীরস্বরে বলল—বাবুজী, এ পুঁথি আমি আপনাকে দিয়ে যেতে চাই।

তাঁবুর মধ্যে বজ্রপাত হলেও এত চমকাতাম না। ঘাবড়ে গিয়ে চেয়ে থাকি। মুখ দিয়ে শুধু বেরোয়—হ্যাঁ, সে কি?

—লামা চিম্-পো বলল—বুঝতে পারছি আমার শরীর আর জোড়া লাগবে না। আমার জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। তুল হোয়াং থেকে তিব্বত যাবার পথ বড় খারাপ। চড়াই উৎরাই পাহাড়। প্রচণ্ড শীত। হয়তো পথেই মরে যাব। মারা গেলে আমার দুঃখ নেই। আমার জীবনের ব্রত সফল হয়েছে কিন্তু ভয় হয় আমার সঙ্গে সঙ্গে যে এই অমূল্য সম্পদও নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি বাঙালী ভারতবাসী। বুদ্ধের দেশের লোক। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দেশের লোক। এ পুঁথির আপনি উপযুক্ত মর্যাদা দেবেন।

দেশ-বিদেশে ঘুরে আমার জ্ঞান জন্মেছে। বুঝেছি, এমন ঐতিহাসিক সম্পদ আমার মতো অশিক্ষিতের কাছে থাকা বা কোনো গুম্‌ফার অন্ধকারে বন্দী থাকা উচিত নয়।

এ পুঁথি আমি পড়েছি বটে। কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক জটিল দার্শনিক আলোচনা আছে, তাদের মানে আমি ভাল বুঝি নি। উচিত আপনাদের মতো পণ্ডিত এই পুঁথি নিয়ে গবেষণা করবেন। ব্যাখ্যা করবেন। সকলে জানবে—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাণী। তবেই একে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে।

বাবুজী, না করবেন না। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। মনে করুন এ হচ্ছে দরিদ্র ভিক্ষুর সামান্য ঋণশোধ। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে রাখছি। আমি আর দু'এক দিনের মধ্যেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব।

—চলে যাবার জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আর কিছুদিন থাকুন বিশ্রাম নিন। শরীরটা পুরোপুরি সারুক। ফুশে বলল।

—না সাহেব। বাধা দেবেন না। আপনাদের সেবা যত্ন আমি কখনও ভুলব না। কিন্তু এক জায়গায় বসে থাকতে আর আমার মন চাইছে না শরীর আমার সেরে গেছে। তা ছাড়া তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা দরকার

—কেন?

—বেরুবার সময় আমার ভক্তাশিষ্য লামা-ছো-র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি পর্যটন সমাপ্ত করে তুন হোয়াং অবধি আসতে পারি তাহলে দেশে ফিরে তার সাথে দেখা করব। সে হয়তো আজও সেই ভাঙ্গা-চোরা গুহায় আমার অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে।—কি বাবুজী, পুঁথি নেবেন তো।

কি বলব? এ দান প্রত্যাখানের শক্তি আছে আমার? এ যে অতি দুর্লভ বস্তু, এমন একটা পুঁথি পেলে আমার মত যে কোন ঐতিহাসিক বর্তে যাবে, জীবন সার্থক মনে করবে!

তিব্বতে দীপঙ্করকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে। তাঁর স্মৃতি' তাঁর নিজের হাতে লেখা পুঁথি একজন তিব্বতী বৌদ্ধর কাছে যে কত প্রিয়, কত পবিত্র জিনিস তা কি আমি জানি না? কৃতজ্ঞতায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। কোন রকমে উচ্চারণ করলাম—

আপনার দান আমি মাথা পেতে নেব। এ পুঁথির উপযুক্ত মর্যাদা দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি।

লামা বলল—ধন্যবাদ। আমি জানি বাবুজী আমি জানি, আপনি পারবেন।

সে পাতাগুলি একটি একটি করে বাক্সের ভেতর গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে—পুঁথি আমি আজ দিচ্ছি না। এখান থেকে বিদায় নেবার ঠিক আগে এ-বস্তু আপনার হাতে সমর্পণ করে যাব। চলি—নমস্কার।

বাক্সটা জামার গোপন পকেটে ঢুকিয়ে রেখে সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যায়।

লামা চলে যেতেই ফুশে আমার হাত ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল—

রয় এইবার? ফসিল পাচ্ছিলাম বলে হিংসে করছিলে। তোমার বরাতে নাকি কিছুই জুটল না। এই বার তো বাবা কেল্লা ফতে। দীপঙ্করের পুঁথি আবিষ্কার করে তুমি ফেমাস হয়ে যাবে।

রাতে—খাচ্ছি। ঠিক যে আশংকাটা করছিলাম তাই।

বার কয়েক নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করেই চুং কথাটা পাড়ল—

একটা পুঁথি দেখলাম যেন? মাঙ্কটা দেখাচ্ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ। খুব পুরনো পুঁথি, আমি বলি।

—হ্যাঃ। ওরাতো সব পুঁথিকেই বলে—দারুণ পুরনো, দারুণ দুষ্প্রাপ্য, দারুণ দামী। সব বোগাস্ আমি একজন ভিক্ষুকে জানি তার কাছে কয়েকটা পুঁথি ছিল। ব্যাটা বলে বেড়াত, সব কটাই নাকি দারুণ জিনিস। কোনোটা হিউয়েন সাংয়ের লেখা, কোনোটা ফা-হিয়েনের, কোনোটা জিন-গুপ্তের। পরীক্ষা করে জানা গেল—গুল। সব রদ্দিমাল।

নানা এটা খাঁটি জিনিস—ফুশে বলল।

বটে। পুঁথিটা কার শুনি? চুংয়ের কণ্ঠে অবিশ্বাস। মুখে চাপা হাসি।

ফুশে চটল। আমি বাধা দেবার আগেই হাতটাত নেড়ে জোর গলায় বলে উঠল—কার জান? দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম শুনেছ? পুঁথি তাঁর নিজের হাতে লেখা।

—এ্যাঁ, ঠিক বলছেন। তানচুংয়ের রক্তিম চক্ষু বিস্ময়ে মার্বেলের মতো গোল হয়ে ওঠে।

—আলবৎ। আমার কচি খোকা নাই। পুঁথি আসল না নকল চেনার বিদ্যে আমাদের আছে। আমি ও দুজনেই পরীক্ষা করে দেখেছি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম লেখা আছে—তাঁর নিজের হাতে।

—আরে ব্বাস। অরিজিনাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান! বলেন কি? তবে যে স্যার বলেছিলেন—লোকটা বেজায় গরিব। খেতে-পরতে পায় না। বই ছাপার পয়সা নেই।

—যাব্বাবা। এর মধ্যি টাকা-কড়ির প্রশ্ন এল কেথেকে। লামার—ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের সঙ্গে পুঁথির কি সম্পর্ক?

তার মানে? আমি বলি।

—মানে ও বস্তু যার পকেটে আছে সে তো বড়লোক। অনেক কোটিপতি আছে যাদের নেশা পুরনো পুঁথি জমানো। একখানা, জেসুইন্ দীপঙ্করের ম্যানুস্ক্রিপ্ট পেলে তারা এখুনি ঝট্ করে বেশ কয়েক হাজার টাকা বের করে দেবে। এইতো আগের বছর। এক বুড়ো আমেরিকান এসেছিল এ-অঞ্চলে। তেলের খনির মালিক। প্রচণ্ড পয়সা। এসেই রটিয়ে দিল—পুরনো জিনিস চাই। দামের জন্য পরোয়া নেই।—লোকটা রাম বুদ্ধু ছিল। আসল-নকল ফারাক্ চিনত না। অনেকে তাকে প্রচুর বাজে মাল গছিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু লামা মোটেই তার পুঁথি বিক্রি করতে চায়না। ফুশে বলল। ও বরং—

আমি গোপনে ফুশেকে চোখ টিপি। আমায় পুঁথি দানের বৃত্তান্ত না আবার বলে বসে।

তান্-চুং বলল—ও না চাইলেও অন্যরা কিন্তু চাইবে। আমি পিকিং, সাংহাইয়ে অনেক ব্যবসারীকে জানি পুরনো জিনিসের কারবার করে। এ রকম দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস পেলে মোটা টাকা দিয়ে—কিনে নেয়। চোরাই মাল হলেও মাথা ব্যথা নেই, বরং সুবিধেই। কিছু কমে পাওয়া যায়। তারপর সে সব জিনিস তারা বেচবে—ইউরোপ, আমেরিকার কিউরিও পাগল বড়লোকদের কাছে—বহুগুণ লাভে।

—য়্যাই লি, তা করে দাঁড়িয়ে আছে কেন? রুটি দাও, মাংস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

লি প্রথামতো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তান্-চুংয়ের প্লেটে কয়েকখানা রুটি দেয়।

খেতে খেতে তান-চুং আর একবার পুঁথি প্রসঙ্গে আসে—

আপনাদের লামাকে সাবধান করে দেবেন—যেন যেখানে সেখানে পুঁথির গল্প না করে। এ বড় খারাপ দেশ। মাত্র কটা টাকার জন্যে মানুষ খুন হয়ে যায়। ক্রমশঃ

(উত্তর দেবার শেষদিন ৩১শে মার্চ)

(১)

বাৎসরিক পরীক্ষার অঙ্কের নম্বর জানবার পরে ইলা-নীলা লীলা ও শীলা, নিজের নম্বর সঠিক না জানিয়ে, অন্যদের নম্বর জানবার চেষ্টা করছিল।

কথাবার্তায় বোঝা গেল যে :—

(১) ওদের চারজনের নম্বরের যোগফল হল ৫০০।

(২) ২০০র মধ্যে প্রত্যেকেই ১০০র বেশি পেয়েছে।

(৩) নীলা আর লীলা সমান নম্বর পেয়েছে,—প্রত্যেকেই ১২০র বেশি।

(৪) শীলা পেয়েছে সবচেয়ে বেশি।

(৫) যে সব চেয়ে কম পেয়েছে, সে তার আগের জনের চেয়ে মাত্র ৭ নম্বর কম পেয়েছে!

(৬) যেই শীলা বলেছে যে তার নম্বর একটি বর্গসংখ্যা (square number)। নীলা বলে উঠল যে সে সকলের নম্বর বুঝে ফেলেছে!

তোমরা বলতে পার কে কত নম্বর পেয়েছিল?

(১)

গোবর গণেশ গড়গড়ি নিলামে দুখানা পুরোন মটরগাড়ি কিনেছিল, কিন্তু মেরামত করতে গিয়ে, খরচের বহর শুনে তার চক্ষু চড়ক গাছ!

আবার সে গাড়ি দুটো নিলামে বিক্রি করে দিল। প্রত্যেকটি ৬০০০৲ টাকায় বিক্রি করার ফলে, একটা গাড়িতে ২০% লাভ ও অন্যটায় ২০% লোকসান হল। মোট তার লাভ বা লোকসান কিছু হল কি? হয়ে থাকলে, কত?

(৩)

মজার———শোন, হে———ভাই,
——রাজে রোজ——খাওয়ায় সবাই !
———বসিয়া সুখ———কি তাঁর
সারা——মাছ——পোলাও আহার !
ঘীয়ে——চপ, ফ্রাই, ——, কাটলেট,
—কি, ইলিশ, চিংড়ি আসে রোজ——
সর্ষে——য় রাঁধা——মাছ ঝাল,
——রাবড়ি মাখা পক্ক—— !
মন——ক্ষীর, দৈ যত চায়——,
না মানে——যেন মত্ত——— !

(প্রত্যেক লাইনের দুটি শূন্যস্থানে এমন দুটি শব্দ বসাও যা ঠিক একরকম কিন্তু ভিন্ন অর্থ, যথা:—পত্র = পাতা আর পত্র = চিঠি)।

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর :—

শ্বেতাম্বর = ছুতোর, পীতাম্বর = রং মিস্ত্রি, নীলাম্বর = রাজমিস্ত্রি, দিগম্বর = কামার।

(২)

পরশু বৈকালে খবর আসিল নাগমহাশয়ের দোকানে নতুন সন্দেশ আসিয়াছে। খবর পাইবা-মাত্রই আমি দোকানে গমন করিয়া দেখিলাম ছোটবড় হরেক ব্যক্তি তাহার তসবীর দর্শন করিতেছে।

(৩)

(ক) **জামা** পরে থাকে বুড়ো **মাজা** ব্যথা পাছে হয়।
(খ) ভেজা **কাঠ** কিনি যদি ঠকা হবে নিশ্চয়।
(গ) শিখি হেসে ডেকে **কাকে** বলে **কেকা** ধ্বনি করে
(ঘ) হেন **লেজ** যার কেন **জলে** ডুবে নাহি মরে !
(চ) মামাবাড়ি ভারি **মজা** আম **জাম** খাই ঢের !
(ছ) হাল **বিনা** কিবা হাল হবে বল **নাবিকের** !
(জ) **কাটা** ফল বেচে যদু কিছু **টাকা** পায় রোজ,
(ঝ) **হেন** ধন **নহে** যাতে পেট ভরে খাবে ভোজ !

পৌষমাসের ধাঁধার উত্তর-দাতাদের নাম :—

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক :—

১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্ত্তী, ১৭৫ অনিতা রায়, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৫৪ জয়শ্রী রায়, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ৮৫৫ পিয়া

বোস, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলনচাঁপা চৌধুরী, ১২৩২ নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার, ১৪১৮ শেখর নাহার, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৬৫১ হাম্বির মজুমদার, ১৬৭২ শুভ্রাশিস গুহ, ১৬৯৩ শ্যামলকুমার পাইন, ১৭৮৮ পলাশবরণ পাল, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ১৯৭১ মৃণালকান্তি মণ্ডল, ১৯৭৫ নীলাঞ্জনা সেন, ১৯৯৭ অনসূয়া বসু, ২০৭২ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮৪ ইন্দ্রনীল ও পলা সেনগুপ্ত, ২০৯৩ দেবাশিস দত্ত, ২১৫২ সুরজিৎ, অনুপা ও শিপ্রা কর-পুরকায়স্থ, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২২৪ শুভময়, কল্যাণময় ও নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২২৬১ অরুন্ধতী ব্যানার্জী, ২৩৫৯ শোভনকান্তি সাহা, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৪০৩ সুস্মিতা দাশগুপ্ত, ২৪৬৬ অর্ধেন্দু ও মমতা কর্মকার, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিতবিক্রম ঘোষ, ২৪৭১ শর্মিলা মিত্র, ২৫৫৪ দেবাশিস ভট্টাচার্য, ২৬১২ চৈতালী সান্যাল, ২৬২৮ রঞ্জন ও শুভাশিস ব্যানার্জী, চিত্রাঙ্গদা ও চৈতালী বসু, ২৭১৩ সৌমিত্র ব্যানার্জী, ২৭১৮ রুমঝুম রায়চৌধুরী, ২৭৬৩ শর্মিলা ও সব্যসাচী বসু, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত, ২৮৩৭ অর্পিতা রায় চৌধুরী, একজন নামনম্বর হীন, দুইজন পাঠক।

দুটো উত্তর ঠিক ঃ—

৪৯ শর্ম্মিলা সেন, ৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ২২৬ জয়ন্ত ও প্রবাল নন্দী রায়, ৩৯৩ নন্দিতা, বন্দনা ও জ্যোতির্ময় বরাট, ৬৯৩ ঋত্বিক ও ঋতা গুপ্ত, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯৩৮ আলোকময় দত্ত, ১২১৩ সুগত, স্বাতী ও সোমা ঘোষ, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪২৫ মিত্রা রায়চৌধুরী, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঞ্জন, সমীর ও মিতালী গুহ, ২০৪৭ তনিমা ও তনুশ্রী বসাক, ২১৫৯ স্বাহা, শুভঙ্কর বাগচী ও সুচ্ছন্দা চৌধুরী, ২৩৩১ অমিতাভ চৌধুরী, ২৪৪১ দেবোপম চক্রবর্তী, ২৫৪৪ সাস্বনা রায়চৌধুরী, ২৫৪৭ মৈত্রেয়ী ও প্রসেনজিৎ বসু, ২৫৬১ সিদ্ধার্থ রায়, ২৬৭৬ খোকন সমু, আশু, খুকু ও টুটু (গ্রাহকের নিজের কি হল ?) ২৭৩৫ উৎপল ও সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য, ২৭৮২ সুপ্রভাত, সুমিতা ও সুবীর মৈত্র, ২৯৭৭ মিতা সেনগুপ্ত।

একটি উত্তর ঠিক—

১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ৫৭৬ মনিদীপা চৌধুরী, ২২০২ শুভাশিস ধর।

পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক ভ্রমণ

শ্রীউত্তমকুমার বটব্যাল

গ্রাহক নং—১৪৮১ বয়স ১২—বছর

২৭শে ডিসেম্বর তোমাদের কাছে স্মরণীয় না হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে ঐ তারিখটা মজা, হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দের দিন। কলকাতার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমরা হচ্ছি গ্রামের ছেলে, কলকাতা দেখাও আমাদের সবসময় হয়ে ওঠে না। তাই আমি ও দাদা বিকেল বেলায় কলকাতার কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখে রাত ৮টার সময় ফিরলাম।

কিন্তু কলকাতা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যাব পুরী, ভুবনেশ্বর ইত্যাদি নানা তীর্থস্থানে। তাই সেদিন রাত ৯½ টায় হাওড়াপুরী এক্সপ্রেস ধরে পাড়ি দিলাম সুদূরের অভিযানে। যেতে যেতে কি আনন্দ, কি মজা হচ্ছিল তা লেখার দ্বারা বোঝানো মুস্কিল। প্রায় সারা রাস্তাই ঘুমাইনি। আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, দাদার সঙ্গে কলকাতার এক বন্ধুও ছিল। সে আর দাদা এক কলেজে পড়ে। সেও নাকি পুরীতে তার আত্মীয়বাড়ি যাবে। যাক্ ভালোই হল। ট্রেনে যেতে বেশ মজা লাগছিল।

পরদিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে আমরা পুরী পৌঁছলাম। থাকবার ব্যবস্থা হল দাদার সেই বন্ধুর বাড়িতে। পুরীর সমুদ্রে মজা করে স্নান করলাম। দিগন্তপ্রসারী এই সমুদ্রকে সেদিন প্রথম দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। স্নান করে আমরা হোটেলে খেয়ে এলাম। বিকালের দিকে জগন্নাথের মন্দির ঘুরে এলাম। তীর্থযাত্রীদের সমাগমে জগন্নাথদেবের মন্দির একবারে গমগম্। জগন্নাথদেবের মন্দিরের

গাত্রে ও ফটকের অপূর্ব শিল্পের কাজ দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। অতীতের এই শিল্পীদের মনে মনে শ্রদ্ধাও জানালাম। পাথরের উপর খোদাই করা এই অপূর্ব কারুকার্য সবাইকে আকৃষ্ট করবে। জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের ফটোও তুলে এনেছি আমরা। পরদিন প্রাতে সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখলাম। সমুদ্রের অসীম তল থেকে কে যেন একটা লাল বুদ্‌বুদ্‌ ছেড়ে দিল অসীম দিগন্তে। আকাশটা লাল হয়ে গেল। কেউ যেন আকাশের গায়ে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। সূর্যদেব একটু একটু করে যেন সমুদ্রের তলা থেকে উঠছেন। এই সূর্যোদয়ের স্মৃতি আমার অন্তরে চিরদিন গাঁথা থাকবে।

বেলা পড়লে দোকানে জল খাবার কিনে খেলাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল আবার আমরা সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম সূর্যাস্তের ছবি। ধীরে ধীরে লাল সূর্য যেন সমুদ্রের তলায় ডুব দিল। এই সমস্ত দেখে মনে কি আনন্দই না পেয়েছিলাম প্রকাশ করা যায় না। আমরা সেদিন পুরীর শহরেও গিয়েছিলাম বেশি বড় নয়, ছোট্ট শহর। পুরীর অধিকাংশ স্থানেই মন্দির। সেখানে দু'একটা ঝিনুকের তৈরি জিনিসপত্রও কিনেছিলাম।

পরদিন সকালে ভুবনেশ্বর পাড়ি দিলাম। পুরী থেকে ভুবনেশ্বর প্রায় ৩।৪ ঘণ্টার পথ। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখলাম। আবার বিস্মিত হলাম মন্দিরের গাত্রের সূক্ষ্ম অপূর্ব কারুকার্য দেখে। প্রাচীনকালের দেবদেবীদের সব মূর্তি। অনেক অপ্সরার মূর্তিও রয়েছে। যাঁরা এই সমস্ত কারুকার্য করেছেন তাঁরা যে কত বড় শিল্পী তা এই সমস্ত চিত্র থেকেই বোঝা যায়।

আমরা উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতেও গিয়েছিলাম! সেখানে প্রকৃতির মনোরম শোভা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভুবনেশ্বর 'বিন্দু সরোবর' দেখলাম। কোনারকের মন্দির দেখতে গেলেন।

কোনারকের মন্দির থেকে সমুদ্র এখন ৩।৪ মাইল দূরে। শুনলাম আগে নাকি মন্দির সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত ছিল। আমরা প্রথমে গেলাম নাটমন্দিরে। সামনে দুটি সিংহমূর্তি।

আসল মন্দিরটা রথের মতো। নাটমন্দিরের কিছু দূরেই এই সূর্য মন্দির। প্রতিটি মন্দিরেই অপূর্ব কারুকার্য। সবচেয়ে বিস্মিত হলাম সূর্যমন্দির দেখে। সূর্যমন্দির প্রায় ৬।৭টি বিশাল চাকা রয়েছে। দু'পাশে দুজোড়া করে ঘোড়া সূর্যমন্দির টানছে। বিশাল চাকাগুলির মধ্যেও রয়েছে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য। অনেক চাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মন্দিরের ভিতর তখন মেরামত হচ্ছিল। মন্দিরের চারিদিকেই সুনিপুণ শিল্পীর হাতের কারুকার্য। মন্দিরের এই সমস্ত কারুকার্য দেখে সবাই অবাক হয়ে যাই।

আমরা সেদিন সন্ধ্যা ৮টায় পুরী পৌঁছলাম। পরদিন জগন্নাথদেবের মন্দিরে পূজা দিলাম। সমুদ্রে স্নান করেছিলাম। ঢেউয়ের মাতামাতিতে স্নান করতে খুব মজা লাগছিল। সেইদিন সন্ধ্যা ৬টায় পুরী এক্সপ্রেস ধরে কলকাতা পৌঁছলাম. পরদিন বেলা ১০½টায়। এসে চিড়িয়াখানা যাদুঘর ইত্যাদি দেখলাম। আমরা সব জায়গায় ফটোও তুলেছিলাম। এখন সেই সমস্ত কোনারকের সূর্যমন্দির পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ইত্যাদি ফটোগুলি দেখি। আর মনে পড়ে যায় সেই ভ্রমণ কাহিনী।

আমার গ্রাম

অনীতা চট্টোপাধ্যায়

গ্রাহক নং—২২৩৯ বয়স—১৩ বৎসর

শহর থেকে অনেকদূর
স্টেশন বোধ হয় আলিপুর।
গ্রামের নাম কুমারগ্রাম
খুব নিকটে আছে আসাম।
নামের শেষে আছে দুয়ার
চোখে পড়ে ভোটান পাহাড়।
ভীষণ নদী যে রায়ডাক
বর্ষাকালে বড় হাঁকডাক।
আর এক পাশে নদী সংকোশ
বানের জলে দেখায় রোষ।
জেলা হল জলপাইগুড়ি
চায়ের বাগান ভুরি ভুরি।

যেদিক তাকাই বনশোভা
বড়ই মধুর মনোলোভা।
হাতি বাঘ জানোয়ার যত
গভীর বনে বেড়ায় শত।
আপন মনে সাপের চলা
বুঝিয়ে সব যায় না বলা।
সুধাকণ্ঠের পাখির গীতি
গ্রাম্যলোকের সহজপ্রীতি।
খোলা আকাশ মুক্ত বাতাস
নানা ফুলের গন্ধে সুবাস।
সবার তরে রইল প্রীতি
এইখানেতে করলাম ইতি।

চিঠি

অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়

বয়স ১৪, গ্রাহক নং ১৪৫৮

'সম্পাদক', 'সম্পাদিকা' একটা কথা শোন,
দিলাম তোমাদের অনেক চিঠি উত্তর যে নেই কোন।
আমার একটা দুঃখের কথা বোঝনা কেন হায়!
কতদিন যে বসে থাকি উত্তরের আশায়!
অনেক কবিতাই পাঠালাম প্রিয় পত্রিকায়
'অমনোনীত' বললেই পার, খেদ নেই মোর তায়।

যাহোক, ছোট্ট চিঠি এবার এইখানে শেষ করি
'সন্দেশে'র এ গ্রাহিকাটিরে যেওনা বিস্মরি।
১৪৫৮ গ্রাহিকা সংখ্যা অলকানন্দা নাম,
চট্টোপাধ্যায় পদবী মোর পানিহাটী ধাম।
আর এক শুনে রাখ বয়স আমার চোদ্দ।
প্রণাম নিও তোমরা দুজন। শেষ করি এই পদ্য॥

মিনিমার দুঃসাহসিক অভিযান

(ইংরাজী গল্পের অনুবাদ)

মিত্রা রায়চৌধুরী গ্রাহক সংখ্যা ১৫২৫, বয়স ১৩

নদীর ধারের মাঠটায় ইঁদুরদের একটা ঘাস আর পাতায় মোড়া পরিষ্কার বাড়ি ছিল। ওদের বাড়িতে অনেক শস্য জমা ছিল আর ওদের বাড়ির বাচ্চারা দিনে দু'বার করে দাঁতে ধার দিত। ওদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে মিনিমা জমিদার বাড়ির ধনী ইঁদুরদের মতো গান গাইতে পারত। ওর বাবা মা

ভাবতো ও বড় হয়ে এক পেশাদার গাইয়ে হবে। কিন্তু মিনিমা ওরকম কোন স্বপ্ন দেখত না। সে নির্ঝরের কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে শুনতে সবুজ বনভূমির উপর খেলা করতে ভালবাসত আর আগন্তুকদের সাথে গল্প করতে ভালবাসত। কিন্তু একদিন ওর মা ওকে ডেকে নিষেধ করাতে মিনিমা ক্ষুব্ধস্বরে বলল, 'কিন্তু মা, আমাদের তো প্রতিবেশিদের সঙ্গে গল্প করা উচিত', মা বললো, 'হ্যাঁ, উচিত, কিন্তু তোমার এত বোঝা দরকার উচিত কোথায় সীমারেখা টানবে। যাও, এখন বেড়াতে যাও।'

মিনিমা যখন নলখাগড়ার বনে গিয়ে সুর ভাঁজছিল, তখন ও দেখতে পেল একটা খুব সুন্দর পাখি এসে উঠলো গাছের ডালে বসল। পাখিটার মাথা আর পিঠ নীল, বুকটা লাল। মিনিমা ওকে দেখে ভাবল যে ও নিশ্চয় ভারত বা আফ্রিকার মত সূর্যের দেশ থেকে এসেছে। সেখানে সূর্যের আলোকে ওর রত্নের মতো শরীরটা ঝলমল করে ওঠে।

ও যখন এইসব ভাবছিল, তখন হঠাৎ পাখিটা কথা বলে উঠল, 'এই, তুমি কি জান নোয়ার জাহাজটা কোথায়?' মিনিমা বলল, 'না, জানিনা, কারণ আমি তো একটা সামান্য ইঁদুর। তবে তুমি বুড়ো ব্যাঙকে জিজ্ঞাসা করতে পার, সে খুব জ্ঞানী আর সব কথা জানে।' পাখি বলল, 'এই নদীতে নোয়ার জাহাজ পাওয়া যাবে কিনা কে জানে, যাও না, একবার আমার হয়ে বুড়ো ব্যাঙকে জিজ্ঞাসা করে এস।'

মিনিমা নলখাগড়ার ডাল ছেড়ে যে গর্তে বুড়ো ব্যাঙ বাস করত সেখানে ছুটে গেল। 'ব্যাঙভায়া ও ব্যাঙভায়া' সামনের দরজার নীল ঘণ্টাটা নাড়িয়ে মিনিমা ডাক পাড়তেই দরজাটা খুলে গেল। মিনিমা বলল, 'ওখানে উইলো গাছের গালে একটা খুব সুন্দর পাখি এসেছে, ও জিজ্ঞাসা করছে নোয়ার জাহাজটা কোথায়?' ব্যাঙ বলল, 'হুম্, খুব সুন্দর পাখি—গায়ের রঙ লাল আর নীল-সবুজ। আর বিদ্যুতের চমকের মতো উড়ে বেড়ায়—তাই না?' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি কি চালাক, সব জান' মিনিমা প্রশংসার কণ্ঠে বলল, 'ওর নাম হচ্ছে মাছরাঙা, ও সবসময় নোয়ার জাহাজ কোথায় জানতে চায়। তবে হ্যাঁ, খুব সাবধান, ওর সামনে কখনো ঘুঘু পাখির কথা বলবে না' 'কেন?' 'নোয়া প্লাবনের পর একটা ঘুঘুকে কোথাও ডাঙা আছে কিনা দেখবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, ঘুঘু ফিরে আসবার পর মাছরাঙাকে পাঠিয়েছিলেন, তখন কিন্তু ও এত সুন্দর ছিল না ওর গায়ের রঙ ছিল ধূসর। ও এত উঁচুতে উঠে গেছিল যে আকাশের রঙে ওর পিঠের রঙ নীল হয়ে গেছে আর সূর্যের রশ্মিতে বুকটা লাল হয়ে গেছে। ও যখন কোথাও মাটি খুঁজে পেল না তখন ও জাহাজে ফিরে আসবে ঠিক করল। কিন্তু ওর ফিরে আসতে এত দেরি হয়েছিল যে ইতিমধ্যে নোয়া আর তার লোকজন পৃথিবীতে ফিরে এসেছে আর জাহাজটাও ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু ঐ বোকা পাখিটা এখনো নোয়ার জাহাজ খুঁজছে।'

দয়ালু মিনিমা দুঃখিত মনে গল্প শুনল। তারপর ও আবার নলখাগড়ার বনের কাছে ফিরে এল। হঠাৎ মাছরাঙাটা জলের উপর উড়ে গিয়ে একটা মাছ ধরে নিয়ে এসে খেয়ে ফেলল। এই না দেখে মিনিমা ভীষণ ভয় পেয়ে ঠিক করল বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু মাছরাঙা ওকে দেখতে পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হে, নোয়ার জাহাজের খোঁজ পেয়েছ নাকি। পাবে না যে তা আমি জানতাম। ও

বাড়ি যাচ্ছ বুঝি? আচ্ছা, কাল আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তোমার চায়ের নেমন্তন্ন রইলো। ওরা বাড়িতে লোক এসে ভীষণ খুশি হয়।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই, মাছরাঙা আবার নদীর দিকে উড়ে গেল। অগত্যা মিনিমা বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে সব কথা মাকে বলার পর মা বলল 'হুম, মাছরাঙা' 'কিন্তু মা, ও খুব সুন্দর পাখি। ওর গায়ের পালকগুলো যে কি সুন্দর তা যদি তুমি—' 'যা কিছু চকচক করে তাই সোনা হয় না' মা বাধা দিয়ে বলল। মিনিমা বলল, 'কিন্তু ওরা খুব প্রাচীন পরিবার, কারণ ওদের পূর্বপুরুষ নোয়ার জাহাজে ছিল।' 'আমরাও ছিলাম মা গর্বের সুরে বলল, আমাদের অনেকেই, যাক আমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করব কাল তুমি যাবে কিনা, এখন দাঁতে ধার দিয়ে শুতে যাও।'

কিন্তু মিনিমা অনেকক্ষণ ধরে আকাশের তারা দেখতে লাগল আর ভাবতে লাগল আকাশের নীল রঙ পাওয়া কি ভাগ্যের কথা।

পরদিন আর সকলের ঘুম ভাঙার আগে ও জেগে উঠে সটান বুড়ো ব্যাঙের বাড়ি চলে গেল। ব্যাঙ তখন সবেমাত্র সকালের জলযোগ করছিল। 'কি একটা পোকা খাবে নাকি? খাবে না, আচ্ছা তবে ডাবাতে এক ব্যাগ মাছি আছে, ওর থেকে খাও। এত তাড়াতাড়ি যে?'

'কারণ, আমি খুব উত্তেজিত হয়ে আছি। যদি বাবা আমায় অনুমতি দেয়, তবে আমি আজ মাছরাঙাদের সঙ্গে চা খাব। আচ্ছা, ওরা কি আমায় গান করতে বলবে? তুমি কি জান ওরা কোথায় থাকে? আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই' ব্যাঙ একটা পাতা চিবোতে চিবোতে বলল, 'ওরাতো গর্তে থাকে। গ্রীকরা বলে ওরা এক বিশেষ শ্রেণীর পাখি। আমি যদি লাল আর নীল হতাম আর আকাশে উড়তে পারতাম, তবে আমি নিশ্চয়ই বিশেষ শ্রেণীর পাখি হতাম, 'বাস্তবিকই তুমি তাই হতে' মিনিমা বলল, 'গ্রীকেরা কি নোয়ার জাহাজের কথা ও বলেছে? মোটেই না, ওরা অন্য গল্প বানিয়েছে। ওরা পাখিটাকে 'হ্যালসিয়ন, বলে ডাকো ওরা ভাবতো ও ভগবানের পোষা। এই পাখি খুব শান্ত বলে এখনো অনেক লোক শান্তিপূর্ণ সময়কে 'হ্যালসিয়ন দিন' বলে, 'আমি কি করে চা খেতে যাব?'

একথা শুনে ব্যাঙ একটু ফিকফিক শব্দ করল। 'নদীর তীরে উইলো গাছের পাশে, খরগোসের দ্বিতীয় গর্তে ওরা থাকে' ব্যাঙ বলল।

বিকালে বাবার অনুমতি না নিয়েই মিনিমা বেরিয়ে পড়ল। ও গর্তের কাছে পৌঁছে ভাবল নিশ্চয়ই ও ভুল ঠিকানায় এসেছে। কারণ, গর্তের মুখে যে আধ ডজন বাচ্চাপাখি ছিল তাদের গায়ে কোনো রঙের বাহার নেই। এদের দেখতে ঠিক জীবন্ত পিনকুশনের মত। 'হ্যাল্লো বাচ্চাগুলো বলল, 'এস, এস, মা মাছ নিয়ে এলেই আমরা খাব।' মিনিমা ওদের অনুসরণ করে পিছনে পিছনে যে ঘরে ঢুকল সেটা ওর জীবনে সবচেয়ে ভয়পূর্ণ ঘর। মেজেতে নরম পাতা জাতীয় কিছু থাকার বদলে, কত-গুলো কাঁটার মত কি সব ছিল। তছোড়া পচা মাছের মতো কি সব ছিল। তোমার নাম কি? কোথায় থাক? তোমাদের বাড়ি কি এত সুন্দর! তুমি কি জান নোয়ার জাহাজ কোথায়!' একনাগাড়ে প্রশ্ন করে

গেল বাচ্চারা, মিনিমা ঢোক গিলে বলল, 'আমার নাম মিনিমা, আমাদের বাড়িটা যদিও খুব সুন্দর, তবে এরকম নয়। এমন সময় মা বাবাকে আসতে দেখে বাচ্চারা দরজার কাছে ভীড় করলো। মিনিমা তখনই আবিষ্কার করল যে ও যার উপর বসে আছে, সেগুলো মাছের হাড়। এমন সব মাছের হাড় যারা। আকারে ইঁদুরদের থেকেও বড়।

হঠাৎ বাচ্চাগুলো চেঁচাতে লাগল 'ওকি, কোথায় যাচ্ছ', কারণ' ওরা দেখতে পেল সবুজ মাঠের উপর দিয়ে মিনিমা পালাচ্ছে!

'ও নিশ্চয়ই সব মাছ খেয়ে নিয়েছে' এইরকম একটা মন্তব্য করে বাচ্চারা মার কাছে গিয়ে আবদার ধরল, 'মা, একটা গল্প বল—'

'অনেক দিন আগে' মা পাখি বলল, 'নোয়া বলে একটা লোক ছিল, তার একটা জাহাজ ছিল···

দীঘা ভ্রমণ

অতীন্দ্র ঘোষ—গ্রাঃ সংখ্যা ২৪২২ বয়স—১৪

ভ্রমণের নামেই মন বলে ওঠে, আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী। তাই যখন ঠিক হল আমরা দীঘাভ্রমণে যাব তখন স্বভাবতই আমার মন আনন্দে ভরে উঠল।

১লা মে কলকাতা থেকে আমরা রওনা হ'লাম। কলকাতার এসপ্লানেড থেকে যে এক্সপ্রেস বাসটি ছাড়ে তার চারটে সিট রিজার্ভ করা হ'ল। ১লা মে, সকাল ৭টায় আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু। আমি, বাবা, মা আর দিতু—৪জন দীঘা অভিমুখে যাত্রা করলাম। বাসে করে আমরা ১টা নাগাদ পৌঁছুলাম দীঘায়। বাসটা রাস্তা দিয়ে গিয়ে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরতেই এক পলকের জন্য সমুদ্র দেখতে দেখতে পেলাম। (পলকের জন্য এই কারণেই যে তার পরেই দোকান পাট ও Reception officeটি) আর সেই এক পলকের দৃষ্টিতেই সমুদ্রের প্রথম রূপ দেখলাম, মনে পড়ল Wordsworthএর কবিতা yarrow visited তফাৎ এইটুকু যে কবি দেখেছিলেন নদী আমি দেখলাম সমুদ্র। আমরা একটি 'টুরিস্ট কটেজ' ভাড়া করেছিলাম, সেইখানে গেলাম, দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা গেলাম সমুদ্রতীরে 'ঝাউবন'-এর ভেতর দিয়ে। সমুদ্রকে কল্পনা করেছিলাম, আকাশের মত নীল আর তিনতলা সমান ঢেউ। কিন্তু হায় সমুদ্র মোটেই তা নয়। সমুদ্রের রঙ কাছে একেবারে গঙ্গাজলের মত, তবে দিগন্তের পানে তা কিছুটা সবুজ আর নীল বর্ডার দেওয়া। আর ঢেউ? তাতে বুঝি একটা মানুষও ডোবে না! নাই হোক, যা দেখলাম না, তার জন্যে আক্ষেপ রইল না, যা দেখলাম তাই যথেষ্ট বলে মনে হ'ল। দীঘার সমুদ্রের বৈশিষ্ট এই যে এখানকার বেলাভূমি অনেক বেশী প্রশস্ত। তার পরদিন পূর্ণিমা, সেদিন ভরা জোয়ার, সমুদ্রের ঢেউ আর গর্জন আর চাঁদের আলো সব মিলিয়ে যে আবহাওয়া ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

পরদিন আশা করেছিলাম সূর্যোদয় দেখার সুযোগ ঘটবে, কিন্তু রাত্রে বৃষ্টি ও মেঘের ফলে দেখা হল না। সকালবেলায় সমুদ্রের তীরে গিয়ে দেখলাম সমুদ্র জোয়ারের সময় অনেক কাছে এসেছে, বেলাভূমি আর দেখা যায় না। সমুদ্রে স্নান করলাম, কিন্তু আমার এটা ভাল লাগলনা। পাঠক পাঠিকারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ। কারণটা খুলেই বলি। তোমাদের কারও যদি তালপাতার সেপাই শব্দের অর্থ অজানা থাকে আমাকে দেখলে সেটা জানা হয়ে যাবে। খালি গায়ে, মেঘলা আবহাওয়ায়, আর সমুদ্রের হাওয়ায় আমার লাগল শীত। তাও নাবলাম, কিন্তু জলের ঢেউ লাফিয়ে পার হলেও শরীর গরম হ'ল না। সমুদ্রে শুয়েই পড়লাম হাতের ওপর ভর দিয়ে। তাহলে কি হয়, সেই ঢেউয়ের তাড়নায় আমি একেবারে উল্টো দিকে ঘুরে গিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলাম, আর নোনা জল চোখে মুখে গিয়ে, সে কি অবস্থা!

সন্ধ্যাবেলা আবার সমুদ্রের তীরে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আর চাঁদের আলো উপভোগ করলাম, কিন্তু বারেবারে মেঘ ঢেকে দিচ্ছিল চাঁদকে।

পরদিন সকালে দীঘা থেকে কিছু দূরে, হেঁটে যাওয়া যায়, আমাদের পক্ষে, বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তে গেলাম, সেখানে দেখার কিছুই নেই তবে মানসিক আনন্দ—'আমরা উড়িষ্যা ঘুরে এলাম।'

এখানকার সব লোকেরা ওড়িয়া ভাষায় কথা বলে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, সীমান্ত এলাকায় অনেকদিন বাসের ফলে তাদের মাতৃভাষা ওড়িয়ায় পরিণত হয়েছে, কি মজা বলতো?

৩ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় যখন সমুদ্রের তীরে গেলাম তখন মনে হল দীঘায় আজ শেষ সন্ধ্যা। কথাটা ভাবতেও কেমন বুকের ভেতরটা টন টন করে ওঠে উঠল। কী আছে এই ছোট্ট জায়গায় জানিনা কিন্তু তবু ভাবতেই দুঃখ হল। সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমুদ্রতীরে বসে রইলাম, জলের খেলা দেখলাম। রাত্রে খেয়ে উঠে আবার ঝাউবনের ধারে বেড়াতে গেলাম। তখন রাত্রি ১১টা, সমুদ্রতীর ধরে এগিয়ে গেলাম—গেলাম আবার সেই বাজারের ধারের বেলাভূমিতে। দাঁড়িয়ে চাঁদের আলো উপভোগ করলাম।

পরদিন সকালে গোছগাছ করার ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখছি। একবার গেলামও সমুদ্রতীরে। আশ্চর্য, আগের দিন রাত্রে মনটা যে ভারাক্রান্ত হয়েছিল, আজ সকালে তা একদমই নেই। অবাক হলাম। তবু সমুদ্রকে দেখে দেখেও যেন একঘেঁয়ে লাগেনা। প্রতিবারই মনে হয় নতুন কিছু দেখতে পাব, নতুন কোন স্বাদ পাব। পাই কিনা জানি না, কিন্তু আবার আসতে ইচ্ছে করে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

বেলা ১-৩০ মিনিটে বাস ছাড়বে কলকাতা অভিমুখে। মালপত্র বাসে তুলে দিয়ে, আর একবার এলাম সমুদ্রতীরে। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সমুদ্রতীর বেশী দূর নয়।

চললাম সমুদ্রতীরে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে বললাম আবার এখানে আসব এই সমুদ্রকে দেখতে।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, সমুদ্র সেইরকম খেলছে, ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে পাড়ে, এ দৃশ্য যেন ভোলবার নয়।

চোখ ফিরিয়ে নিলেও চোখের সামনে ভাসে, দূরে গেলেও মনের মধ্যে বাজে তার গান। কিছুক্ষণ পর বাসে ফিরে এলাম।

ধাঁধার উত্তর

মিত্রা রায়চৌধুরী গ্রাহক সং ১৪২৫—বয়স ১৩ বছর।

(ক) চিতল (খ) কাশীরাম দাস (গ) শালগম।

ক্রীড়াজগৎ

অজয় হোম

কলকাতায় ক্রিকেট মরসুম প্রায় শেষ। সি এ বি-র অন্তর্ভুক্ত খেলাগুলিই খালি চলছে। আর বাকি আছে রণজি ট্রফির সেমিফাইনাল বাংলার সঙ্গে রাজস্থান ও রেলদলের বিজয়ীর। হকি সবে শুরু হয়েছে। জলন্ধরে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় লীগ কাম নকআউট প্রতিযোগিতার খেলায় ৪টি গ্রুপের মধ্যে 'সি' গ্রুপে সারভিসেস, গুজরাট, ভূপাল, বিদর্ভ ও কেরালার সঙ্গে বাংলাকে প্রায় একটানা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ইনামুর রেহমানের নেতৃত্বে ১৮ জনের একদল গেছে জলন্ধরে। মার্চ মাসের শেষে শুরু হবে কলকাতায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা।

বোম্বাইতে সাতটি দেশের আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতের ব্যর্থ ভূমিকায় ভারতীয় হকির ভবিষ্যৎ ভেবে কর্তৃপক্ষ ভাবিত হয়ে পড়েছেন। কেবলমাত্র ভাবিত হলেই কর্তব্য শেষ হবে না সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

সত্যিই আশ্চর্য লাগে ভারতের মাটিতে প্রতিযোগিতা, তাও পৃথিবীর এক নম্বর হকি দেশ পাকিস্তান, দু'নম্বর অস্ট্রেলিয়া আসে নি। তাছাড়া স্পেন (৬নং), নিউজিল্যাণ্ড (৭নং), কেনিয়া (৮নং), ফ্রান্স (১০নং), পূর্ব জার্মানি (১১নং), ব্রিটেন (১২নং), মালয়েশিয়া (১৫নং) এবং মেক্সিকো (১৬নং) এরাও আসেনি। তাতেই ভারতের বড়ো দল ডার্ক ব্লুজ যথাক্রমে এবং অনেক কষ্টে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। সামনেই এসিয়ান গেমস, তারপর অলিম্পিক।

ক্রিকেট

কলকাতায় ইডেনে ভারতীয় স্কুলদলের চতুর্থ টেস্ট খেলা দেখে খুবই হতাশ হলাম। বড়ো আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। পায়ের তলা দিয়ে বল গলানো, ক্যাচ ফসকানো, অক্লেশে বল ছেড়ে দেওয়া, এইসব ব্যাপার বারবার দেখে অস্থির হয়ে উঠেছি। বারে বারে মনে হয়েছে এই স্কুলদল একসময় অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যণ্ড সফর কি সুনামের সঙ্গে খেলে এসে সিংহলের সঙ্গে এভাবে খেলছে কেন? যে সিংহল এখনও কমনওয়েলথ ক্রিকেট কনফারেনসের সভ্য নয় সেই সিংহলের স্কুলের খেলোয়াড়দের লাগছে যেন নেংটি ইঁদুর। কোথায় হেমু অধিকারী যিনি ইংল্যণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরকারী দলের ম্যানেজার ছিলেন? দল গড়ার ক্ষেত্রে যে প্রয়াস ও প্রস্তুতি দেখা গিয়েছিল ইংল্যণ্ড অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে এবার তার অভাব হল কেন? শুনলাম সিংহলের ছেলেরা নাকি বলে গিয়েছে, 'আমাদের তোমরা আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলে বলেই কোনও খেলায় জিততে পারলে না।' বিপক্ষকে অবহেলা করার কি বিষময় ফল! আত্মবিশ্বাস অবশ্যই থাকবে কিন্তু প্রতিপক্ষকে অবহেলা করা কখনও উচিত নয়। হেম অধিকারীর এইসব উপদেশ ছেলেরা ভুলল কি করে?

সিংহলের ছেলেরা পাঁচ টেস্ট সিরিজের খেলায় ৩টি ড্র করে ২টি খেলায় জিতে রাবার নিয়ে ফিরে গেল। আঞ্চলিক ৫টি খেলার মধ্যে ৪টি খেলায় জয়লাভ। সুতরাং সমগ্র সফরে ১০টি খেলার মধ্যে সিংহল স্কুলদল ৬টি খেলায় বিজয়ী, ৪টি খেলা ড্র। অপরদিকে ভারতীয় স্কুলদলের জয়ের ঘরে ০ শূন্য

ব্যাডমিনটন

চার-চারবার হার স্বীকারের পর বাংলার ছেলে রেলওয়ের প্রতিনিধি দীপু ঘোষ এবার ব্যাড-মিনটনে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। ফাইনালে তিনবার হার স্বীকার করতে হয়েছে সুরেশ গোয়েলের কাছে। এবার কলকাতায় ইডেনে প্রায় ২০ বছর বাদে আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেই সুরেশ গোয়েলকেই স্ট্রেট গেমে হারিয়ে বিজয়ী হল দীপু ঘোষ। সুরেশ গোয়েল তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী মোটেই খেলতে পারেন নি। তাঁর সেই একই অ্যাকশনে স্ম্যাশ ও ড্রপ মারার যে মারাত্মক শট তা ফাইনালের দিন কেমন যেন নিষ্প্রভ ছিল। মোটেই খুলছিল না।

কেবলমাত্র সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়নশীপ নয় ভাই রমেন ঘোষকে নিয়ে ডাবলসেও বিজয়ী হয়ে দীপু ঘোষ দ্বিমুকুটের সম্মান পেয়েছেন।

বড়ো ভালো লাগল উত্তরপ্রদেশের দময়ন্তী সুবেদারের খেলা দেখে। চ্যাম্পিয়নশীপ পেল সেই। গতবারেও পেয়েছিল। কি সুন্দর ব্যাকহ্যাণ্ড স্ট্রোক, তেমনি ফোরহ্যাণ্ড স্ম্যাশ ও ড্রপ শট। ফাইনালে দময়ন্তীর কাছে হেরে গেল যে মেয়েটি মহারাষ্ট্রের শোভা মূর্তি সে খুব সুন্দর খেলে। আর আনন্দ দিয়েছে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন মরিন ম্যাথিয়াস।

ফুটবল

কোচ বদল করলে যে কি হয় তার ফল দেখলাম মোহনবাগান-ক্যালকাটা মাঠে চেকোস্লোভেকিয়ার

ইন্টার ব্রাডিস্লাভা ও আইএফএ-র খেলায়। বছর কয়েক আগে চেকোস্লোভেকিয়ার স্লোভান ব্রাডিস্লাভা দল রবীন্দ্র সরোবরে খেলে গিয়েছিল তারা এর চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল। সেই দলে ছিল প্রোফেশনাল ফুটবলে বিশ্ব একাদশের অন্যতম খেলোয়াড় পপ্‌লুহার। অত বড়ো খেলোয়াড় বিদেশ থেকে ভারতে কোনদিন আসে নি।

বর্তমান ইন্টার ব্রাডিস্লাভা ইওরোপের খুবই মাঝারি একটা দল। খুবই যে ভালো খেলল বা শক্তিশালী দল তাও নয়। অবশ্য এদের আক্রমণ করার পদ্ধতি, পারস্পরিক যোগাযোগ ও রিসিভিং বেশ ভালো। এই মাছারি বিদেশী দলের বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় ফুটবলের বিজয়ী বাংলার খেলোয়াড়দের ভূমিকা দেখে অবাক। ৩-১ গোলে হারাটাই বড়ো কথা নয়। কিন্তু খেলার কি রকম! আক্রমণের তীব্রতা কোথাও দেখা গেল না। সবটাই পদ্ধতির গণ্ডগোল। আধুনিক ফুটবলের একেবারে অনুপযোগী খেলা। নিজেদের মধ্যে বল দেওয়ানেওয়া করার সময় পিছন দিকের খেলোয়াড়দের কাছে বল ঠেললে আক্রমণ কখনই তীব্র হতে পারে না। বল পিছনে ঠেলাতে প্রতিপক্ষ সহজে রক্ষণব্যূহ সাজিয়ে নিয়েছে। তার পরে পায়ে যত কাজই থাক তখন আর রক্ষণব্যূহ ভেদ করা যায় না। তাছাড়া তারা দীর্ঘদেহী খেলোয়াড়, চটুলগতিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে পিছিয়ে খেলে, তাদের প্রতিরোধ গড়ে নেওয়া কিছুই নয়। আই এফ এ-র পিছনে বল ঠেলা খেলা দেখে অবাক হলাম। এ খেলা কে শেখাল?

টেনিস

ডেভিস কাপের খেলায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়দীপ মুখার্জিকে বাদ দিয়ে অল ইণ্ডিয় লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছিল তাঁর খেলায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অথচ তার প্রস্তুতি নেই একদম। বিশ্ব টেনিস খেলতে গেলে যে সংযম ও অনুশীলন এবং যেভাবে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন তা তাঁর মধ্যে একান্ত অভাব এই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এটা শুরু হয় কৃষ্ণানকে হারাবার পর থেকেই। কৃষ্ণানকে হারানো যেন একমাত্র লক্ষ্য, তারপর আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এই নিষ্ক্রিয়তা অলসতার ব্যাধি ভারতের প্রতিটি শীর্ষস্থান অধিকারী যে কোনও খেলোয়াড়েরই সংক্রামক ব্যধি। এদিকে প্রেমজিৎলাল ধৈর্য অধ্যবসায় ও অনুশীলনের ফলে অসম্ভব উন্নতি করে চলেছেন। শশী মেনন ও গৌরব মিশ্র ভারতের দুজন উঠতি-খেলোয়াড় এবার পূর্ণ সুযোগ পাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার।

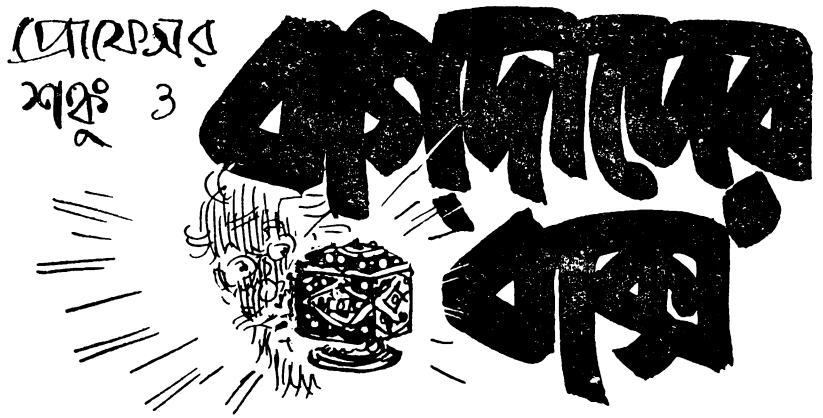

সত্যজিৎ রায়

১৯শে নভেম্বর

গোল্ডস্টাইন এই মাত্র পোস্ট আপিসে গেল কী একটা জরুরি চিঠি ডাকে দিতে। এই ফাঁকে ডায়রিটা লিখে রাখি। ও থাকলেই এত বক্ বক্ করে যে তখন ওর কথা শোনা ছাড়া আর কোন কাজ করা যায় না। অবিশ্যি প্রফেসর পেক্রুচিও আমার সঙ্গেই রয়েছেন, আমার সামনেই বসে, কিন্তু কাল হোটেলে তার হিয়ারিং এড'টা হারিয়ে যাবার ফলে তিনি শব্দটব্দ বিশেষ শুনতে পাচ্ছেন না, ফলে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম বন্ধই করে দিয়েছেন। এদেশের ভাষাটা তার বেশ ভালো ভাবেই জানা আছে, এবং আপাতত তিনি একটি স্থানীয় খবরের কাগজ মুখের সামনে খুলে বসে আছেন।

আমাদের বাসার জায়গাটা হল বাগ্‌দাদ শহরের একটা রেস্টোরাণ্ট। দোকানের বাইরে ফুটপাথের উপর ফরাসী কায়দায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে তার তলায় টেবিল-চেয়ার পাতা, এবং তারই একটাতে আমরা বসেছি। কফি অর্ডার দেওয়া হয়েছে, এই এলো বলে।

বাগ্‌দাদে আসার কারণ হল-আন্তর্জাতিক আবিষ্কারকসম্মেলন অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশনার ইন্‌ভেণ্টরস কনফারেন্স। বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বহুকাল থেকেই পৃথিবীর নানান জায়গায় হয়ে আসছে, কিন্তু আবিষ্কারক সম্মেলন এই প্রথম। বলা বাহুল্য এখানে যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার স্থান খুবই উঁচুতে। পৃথিবীর কোন একজন বৈজ্ঞানিক এর আগে আর কখনো এতরকম জিনিস অবিষ্কার করেনি। যারা এসেছেন, তার সকলেই তাদের লেটেস্ট ইনভেনশনটি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, এবং এই সম্মেলনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল এই সব আবিষ্কারের খবর পৃথিবীতে প্রচার করা। আমি এনেছি আমার 'অম্‌নিস্কোপ' যন্ত্র, এবং এটা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। যন্ত্রটা হল

একরকম চশমা যাতে টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ ও এক্স-রে-এই তিনটে জিনিসেরই কাজ চলে।

কন্‌ফারেন্স কাল শেষ হয়ে গেছে! বাইরে থেকে যারা এসেছিলেন, তাদের অনেকেই আজ সকলে যে-যার দেশে ফিরে গেছেন। আমরা তিনজন আপাতত, আরো কিছুদিন থাকব। আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম হপ্তা-খানেক থেকে যাব সঙ্গে যে আরো দুজনকে পেয়ে গেলাম সেটা কপাল জোরে। আমি নিজে কাউকে কিছুই বলিনি কাল রাত্রে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিনার ছিল, খাওয়া সেরে হোটেলে ফেরার পথে গোল্ডস্টাইন জিগ্যেস করল: 'তুমি কি কালই ফিরে যাচ্ছ নাকি?' আমি বললাম 'হারুণ-অল্-রশিদের দেশে মাত্র সাতদিন থেকে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। ভাবছি দেশটিকে আরকটু ঘুরে দেখব। এখানকার প্রাচীন সভ্যতার কিছু নমুনা চাক্ষুষ দেখে তারপর দেশে ফিরব।'

গোল্ডস্টাইন উৎফুল্ল বলল, যাক, তাহলে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। আর, শুধু হারুন-অল্-রশিদের দেশ বলছ কেন? হারুণ তা মাত্র হাজার বছর আগের কথা। তার আগের কথাও ভাবো!

আমি বললাম। 'ঠিক কথা! আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে গর্ব করি কিন্তু এযে তার চেয়েও অনেক পুরোনো। সুমেরীয় সভ্যতার যেসব চিহ্ন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে, সে তো আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগেকার ব্যাপার। ঈজিপ্টেও এতদিনের সভ্যতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

গোল্ডস্টাইন বলল, 'আবিষ্কারক সম্মেলন এদেশে হবার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে সেটা খেয়াল করেছ নিশ্চয়। এদেশের প্রথম লেখার আবিষ্কার হয় প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে আর এই লেখা থেকেই সভ্যতার শুরু।'

প্রাচীন কালে যাকে মেসোপটেমিয়া বলা হত, তারই অন্তর্গত ছিল ইরাক। মেসোপটেমিয়া টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর ধারে। এখন যেখানে বাগদাদ শহর, তার আশে পাশে পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানুষ দেখা দেয়। এই সভ্যতার নাম সুমেরিয় সভ্যতা। পাথরের গায়ে খোদাই করা পৃথিবীর আদিমতম লেখার অনেক নমুনা প্রত্নতাত্ত্বিকরা বাগদাদের আশে পাশেই আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিকদের পরিশ্রমের ফলে এই সব লেখার মানে বার করাও সম্ভব হয়েছে।

এই প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে অনেক উত্থান পতন লক্ষ্য করা যায়। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে সুমেরিয়দের আক্রমণ করে সেমাইট জাত। যুদ্ধে সুমেরিয়দের পরাজয় হয়। এর পরে ইতিহাসে আমরা ব্যাবিলন ও অ্যাসেরিয়ার উত্থানের কথা জানতে পারি। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পাই জাঁদরেল সব রাজাদের উল্লেখ—নেবুচাদনেজার, বেলসজোর, সেনাচোরিব, অসুরবানিপাল। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন মহৎ ও উদারচেতা, আবার কেউ কেউ ছিলেন দুবৃত্ত, অত্যাচারী।

তখনকার দিনেও ব্যাবিলন শহরের সবচেয়ে বড় প্রাসাদের উচ্চতা ছিল প্রায় ১০০ ফুট।

প্রাসাদে প্রাসাদে শহর এমন ছেয়ে ছিল যে দূর থেকে দেখে মনে হত যেন দেবপুরী। রাত্রেও এ শহরের শোভা কিছুমাত্র কমত না, কারণ দু হাজার বছর আগেই ব্যাবিলনিয়রা তাদের মাটি থেকে পেট্রোলিয়াম আহরণ করে তাকে কাজে লাগাতে শিখে গিয়েছিল। পেট্রোলিয়ামের আলোয় গভীর রাতেও সারা শহর ঝলমল করত।

আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যসেনা এসে ব্যাবিলন আক্রমণ করে, এবং সেমাইটদের পরাজিত করে। এই পারস্যদের মধ্যেও আশ্চর্য পরাক্রমশালী রাজাদের নাম আমরা পাই—দারিয়স, সাইরাস, জেরক্সেস—কেউ মহৎ, কেউ বা প্রচণ্ড ভাবে নৃশংস। এই সময়ই পারস্যদের অন্তর্গত একটা ভবঘুরে জাত বেলুচিস্তানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছায়। এদেরই বলা হয় এরিয়ান বা আর্য। আসলে এরিয়ান ও ইরাকীয়তে কোন তফাৎ নেই।

এই সব কারণে এ-দেশটার সঙ্গে আমাদের ভারতীয়দের যে একটা বিশেষ আত্মীয়তা আছে সেটা ত অস্বীকার করা যায় না। আর ভারতবর্ষে কটা শিক্ষিত লোক আছে যারা আরব্যোপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয় নি? আর হারুণ-অল্-রশিদের বাগদাদের যে বর্ণনা আমরা আরব্যোপন্যাসে পাই, তাতে বেশ বোঝা যায় সে সময় বাগদাদ একটা গম্‌গমে শহর ছিল। আজকের শহরের সঙ্গে গল্পের সে-শহরের বিশেষ মিল নাও থাকতে পারে, কিন্তু যাদের কল্পনাশক্তি আছে, তারা এখানে এসে সেই সব গল্পের কথা মনে করে একটা রোমাঞ্চ অনুভব না করে পারে না।

গোল্ডস্টাইন ফিরছে। সঙ্গে একটা অচেনা বৃদ্ধকে দেখতে পাচ্ছি। স্থানীয় লোক বলেই ত মনে হচ্ছে। পরণে কালো সুট, কিন্তু মাথায় লাল ফেজ টুপি। এ আবার কার আবির্ভাব হল কে জানে।

১৯শে নভেম্বর, রাত ১১টা

আমার এই পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে কত রকম অদ্ভুত লোকের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এইসব লোক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। যদিও এদের অনেকের সঙ্গেই একবারের বেশি দেখা হয়নি। তবুও এদের কারুর কথাই কোনদিনও ভুলতে পারব না।

এইরকম একজন অদ্ভুত লোকের সঙ্গে আজ সকালে আলাপ হল। এঁকেই গোল্ডস্টাইন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক হবারী, নাম হাসান অল্-হাব্বাল। বয়স আমার চেয়েও হয়ত কিছুটা বেশি, কিন্তু গতিবিধি রীতিমত চটপটে ও চোখের চাহনিও আশ্চর্যরকম তীব্র।

গোল্ডস্টাইন আলাপ করিয়ে দিতে ভদ্রলোক হাসিমুখে কুর্ণিশ করে পাশের চেয়ারে বসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার জীবনে আপনিই প্রথম ভারতীয় যার সঙ্গে আমার আলাপ হল। এ আমার পরম সৌভাগ্য, কারণ ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে, সে কথা আমি কখনও ভুলিনা।'

আমি একটা উপযুক্ত মোলায়েম উত্তর দিয়ে মনে মনে ভাবছি গোল্ডস্টাইন হঠাৎ এঁকে আমাদের

মধ্যে এনে হাজির করল কেন, এমন সময় ভদ্রলোক নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেললেন। তিনি বললেন, 'সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এই বাগদাদ শহরে এসেছেন জেনে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছিল। আপনাদের ছবি কাগজে দেখেছিলাম, ইচ্ছে ছিল আলাপ করি, কিন্তু কী ভাবে করব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ পোস্ট আপিসে এঁকে দেখতে পেয়ে আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করি।'

ওয়েটার দেখে আর এক কাপ কফির জন্যে বলে দিলাম, কারণ ভদ্রলোক যেভাবে বসেছেন, তাতে তার যাবার খুব তাড়া আছে বলে মনে হল না। দুহাতের আঙুলে আংটির নমুনা দেখে মনে হচ্ছিল লোকটি বেশ অর্থবান্। পোশাকেও সে ইঙ্গিত রয়েছে।

একটা সোনার কেস খুলে কালো রঙের সিগারের প্রথমে আমাদের অফার করে, তারপর নিজে ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের যে-প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিল সেটা হচ্ছে এই—আপনারা সব বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, কিন্তু আমাদের দেশে কতরকম জিনিস যে হাজার হাজার বছর আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে সেটা কি আপনারা জানেন?'

উত্তরে আমি বললাম, 'তা—প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৌলতে কিছু কিছু জানতে পেরেছি বৈকি। ধরুন, আপনাদের প্রাচীন লেখা, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র, আপনাদের চার হাজার বছর আগের পেট্রোলিয়াম বাতি, আপনাদের—'

অল্ হাব্বাল হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'জানি জানি জানি—এ সবই বইয়ে লেখে সাহেবরা—প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের বই! আমি জানি। আমি পড়েছি। কিন্তু এতো কিছুই না!'

'কিছুই না?' আমি আর গোল্ডস্টাইন সমস্বরে বলে উঠলাম। পেক্রুচিও দেখি হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসে অল্-হাব্বালের ঠোঁটের দিকে চেয়ে আছে; বোধহয় তার ঠোঁট নড়া দেখেই কথাগুলো বুঝে ফেলতে চায়।

অল্-হাব্বাল একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'রেষ্টোরাণ্টে বড় ভীড়, আর রাস্তার গোলমালে গলা নামিয়ে যে কথা বলব তারও উপায় নেই। আপনাদের কফি খাওয়া হয়ে থাকলে চলুন নিরিবিলি কোথাও যাই।'

গোল্ডস্টাইন ওয়েটারকে দেখে পয়সা দিয়ে দিল। আমরা চারজনে উঠে নদীমুখো হাঁটতে শুরু করলাম।

টাইগ্রিস নদীর পাশ দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত একটা চমৎকার বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে, তার একপাশটায় পাম-জাতীয় গাছের সারি। সেই গাছের ছায়া দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অল্ হাব্বাল তার বাকি কথাগুলো বললেন।

ভদ্রলোক প্রথমেই জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা আরব্যোপন্যাস পড়েছ ত?'

আমি বললাম, 'সে আর কে পড়েনি বলুন। এমন গল্পের সম্ভার ভারতবর্ষের বাইরে এক

আপনাদের দেশেই আছে। ছেলেবুড়ো সবাই এ গল্প জানে। অন্তত কয়েকটিত জানেই।'

অল্-হাব্বাল মৃদু হেসে বললেন, 'কী মনে হয় গল্পগুলো পড়ে?'

আমি বললাম, 'মানুষের কল্পনাশক্তি যে কত মজার ও কত রংদার কাহিনী সৃষ্টি করতে পারে, সেটা এসব গল্প পড়লে বোঝা যায়।'

অল্ হাব্বাল আবার সেই অদ্ভুত খিলখিল হাসি হেসে বললেন, 'কল্পনা?—তাই না? সকলেই তাই ভাবে। কল্পনা ছাড়া আর কী হবে—এমন অদ্ভুত সব ব্যাপার কী আর বাস্তবে ঘটতে পারে। অথচ তোমরা যে এখানে কন্‌ফারেন্স করলে, তোমরা সকলেই একটা করে নিজেদের আবিষ্কৃত জিনিস নিয়ে এসেছ, তার মধ্যে অনেকগুলি ভারী অদ্ভুত—একেবারে তাক্ লেগে যাবার মতো। কিন্তু কই—সে গুলোকেত কেউ কল্পনা বলছে না। যেহেতু চোখে দেখছে, সেহেতু সেটা বাস্তব বলে মেনে নিচ্ছে। তাই নয় কি?'

আমি আর গোল্ডস্টাইন পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। নদী দিয়ে একটা বাহারের পালতোলা নৌকা যাচ্ছে—চট্ করে দেশের কথা মনে পড়ে গেল। অল্-হাব্বাল বলল, 'চলুন—ওই বেঞ্চিটায় বসা যাক্।'

ঘড়িতে দেখি সাড়ে এগারোটা।

লোকটা হয়ত ছিটগ্রস্ত। সন্দেহটা কিছুক্ষণ থেকেই আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। নাহলে ওরকম অদ্ভুতভাবে হাসে কেন?

বেঞ্চিতে বসে আরেকটা কালো সিগারেট ধরিয়ে অল্-হাব্বাল বললেন, 'তোমরা যদি প্রতিজ্ঞা কর যে আমি যা দেখাব তা তোমরা কোথাও প্রচার করবেনা, আর আমার দেখানো কোন জিনিস তোমরা নিতে চাইবে না—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'কী আশ্চর্য কথা! তোমার জিনিস আমরা চাইব কেন?'

অল্-হাব্বাল আর একটা ক্রুর হাসি হেসে বলল, 'তোমার কথা বলছি না, কিন্তু'—এবারে তার দৃষ্টি গোল্ডস্টাইনের দিকে—'পশ্চিমের অনেক যাদুঘরেইত আমাদের দেশের অনেক ভালো জিনিসই চলে গেছে কিনা! বেশির ভাগইত বাইরে, তাই ভয় হয় নিজের জন্য না চাইলেও, যদি যাদুঘরের লোক লেলিয়ে দাও!'

গোল্ডস্টাইন কোনরকমে তার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'না-না-তা কেন করব! কথা দিচ্ছি, তোমার জিনিসের কথা কাউকে বলব না। কিন্তু জিনিসটা কী?'

আমি মনে মনে জানতাম, যাদুঘরের লোক লেলিয়ে না দিলেও জিনিসটা যদি তেমন লোভনীয় হয়, তাহলে গোল্ডস্টাইন হয়ত নিজেই সেটার ওপর চোখ দিতে পারে। কারণ প্রথমত, ভদ্রলোক প্রচুর পয়সাওয়ালা মার্কিন ইহুদী, বিজ্ঞান তার শখের ব্যাপার; দ্বিতীয়তঃ, তার আসল বাতিক হচ্ছে পুরোন জিনিস সংগ্রহ করা। বাগদাদে এসে এই কদিনের মধ্যেই আমার চোখের সামনে সে প্রায় হাজার ডলারের খুঁটিনাটি পুরোন জিনিস কিনে ফেলেছে।

অল্-হাব্বাল্ এবার অল্পাধিক রকম গম্ভীর স্বরে বলল, জিনিস একটা নয়—অনেক। খৃষ্টপূর্ব যুগের সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এখন থেকে সত্তর মাইল দূরে যেতে হবে। গাড়ির ব্যবস্থা আমি করব। আমার নিজের গাড়ি আছে।'

এর বেশি আর অল্ হাব্বাল বলল না।

কাল সকালে সাড়ে আটটায় ওর গাড়ি নিয়ে আসার কথা আছে। ভদ্রলোককে বিদায় দেবার পর গোল্ডস্টাইন ও পেক্রুচিওর সঙ্গে কথা হয়েছে। ওদের দুজনেরই ধারণা অল্-হাব্বাল্ একটি আস্ত পাগল যেমন পাগল পৃথিবীর সব শহরেই কয়েকটি করে থাকে। গারদে পাঠানোর অবস্থা। এখনো হয়নি, তবে ভবিষ্যতে হবেনা একথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

সব শুনে আমি বললাম, 'পরের গাড়িতে বিনি পয়সায় যদি বাগদাদের আশপাশটা ঘুরে দেখা যায় তাহলে মন্দ কী?'

হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেয়েছি প্রায় দেড়টায়। দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়েছি। এখানকার ক্লাইমেট খুবই ভালো; শরীরে রীতিমত শক্তি ও মনে প্রচুর উৎসাহ অনুভব করছি।

২০শে নভেম্বর

বাগদাদের মত আজব সহরে আজব অভিজ্ঞতা হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কিন্তু ঠিক এতটা আশা করিনি। রূপকথা কল্পনার জগতের জিনিস। সেটা শুনে বা পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটা একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ যদি দেখা যায়, সে রূপকথার অনেক কিছুই বাস্তব জগতে রয়েছে, তাহলে হঠাৎ কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে যায়।

থাক্‌গে—এবার আজকের ঘটনায় আসা যাক্।

হাসান অল্-হাব্বাল্ তার কথামত ঠিক সাড়ে আটটার সময় তার একটি সবুজ সিত্রোঁয় গাড়ি নিয়ে হোটেলে এসে হাজির হলেন। শুধু গাড়ি নয় গাড়ির ভিতর আবার একটা বেতের বাস্কেট। তার সেই অদ্ভুত হাসি হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'তোমাদের দুপুরের লাঞ্চটা। আমার সঙ্গে রয়েছে। আজ সারাদিনের জন্যে তোমরা আমার অতিথি।'

নটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পেক্রুচিও কাল সারা বিকেলে বাগবাদের দোকানে দোকানে ঘুরে একটা কানের যন্ত্র জোগাড় করেছে, তার ফলে আজ তার মুখের ভাবই বদলে গেছে। গোল্ডস্টাইন এমনিতেই আমুদে লোক—গাড়িতে ওঠার সময় বলল—'ছেলেবেলায় দলে বলে গাড়িতে করে পিকনিকে বেরোতাম—সেই কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

কথাটা বলেই সে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল। বুঝলাম সে অল্ হাব্বালের একটা কথাও বিশ্বাস করে নি। তার অন্য কোন কাজ নেই বলেই সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে, এবং আউটিং এর যে আনন্দ, তার বেশি সে কিছুই আশা করছে না।

টাইগ্রিস নদীর উপর একটা ব্রিজ পেরিয়ে আমরা পশ্চিমদিকে চললাম। এদিকটায় গাছপালা

বিশেষ নেই—রতকটা শুক্‌নো মরুভূমির মত। তবে নভেম্বর মাস বলে গরম একদম নেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে অল্‌-হাব্বাল্‌ বলল, 'আমরা যে জায়গায় যাচ্ছি সেখানে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যে ব্যবধান মধ্যে পঁচিশ মাইল। দুটো নদী এত কাছাকাছি হওয়াটা ব্যাবিলনের সমৃদ্ধির একটা কারণ ছিল।'

একটা প্রশ্ন কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছিল, এখন আর সেটা না জিগ্যেস করে পারলাম না।—

'তুমি কি বৈজ্ঞানিক? মানে, প্রত্নতাত্ত্বিক, বা ওই জাতীয় একটা কিছু?'

অল্‌ হাব্বাল্‌ বলল, 'বৈজ্ঞানিক বলতে যদি ডিগ্রিধারী বোঝায়, তাহলে আমি বৈজ্ঞানিক নই। আর প্রত্নতাত্ত্বিক বলতে যদি মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার নমুনা আবিষ্কার করা বোঝায়, তাহলে আমি অবশ্যই একজন প্রত্নতাত্ত্বিক।'

এদিকে গাড়ি দেখি সমতলভূমি ছেড়ে চড়াই উঠতে আরম্ভ করেছে। দূরে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। অল্‌-হাব্বাল্‌ বলল, 'ওই পাহাড়গুলোই ইরাকের সীমানা নির্দেশ করেছে। ওর পিছন দিকে পারশিয়া।'

চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও ক্রমে বদলাতে বদলাতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ি একটা গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করল। দুদিকে খাড়াই পাহাড়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি। বাগদাদে আসবার আগে আমি ইরাক সম্বন্ধে খানিকটা পড়াশুনা করে নিয়েছিলাম। জিগ্যেস করলাম, 'আমরা কি আবু গুয়াইবে এসে পড়েছি। অল্‌-হাব্বাল্‌ মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। আর দশ মাইল গেলেই আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাব।'

গিরিবর্ত্মের মধ্যে সূর্যের আলো প্রায় পৌঁছোয় না, তাই বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। আমি গলার মাফলারটাকে বেশ ভালো ভাবে জড়িয়ে নিলাম। পেক্রুচিও এখনো পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। লোকটাকে চেনা ভারী মুশকিল। গোল্ডস্টাইনকে দেখে মনে হল তার ঘুমের আমেজ এসেছে।

গিরিবর্ম পেরোতেই দেখি প্রাকৃতিক দৃশ্য আবার বদলে গেছে। কিছুদূরে সবুজ রং দেখে বুঝলাম এদিকটায় গাছপালার অভাব নেই। তারই মাঝে মাঝে আবার ছাই রং-এর পাথরের টিলা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে।

গাড়ি মেইন রোড থেকে বাঁ দিকে মোড় নিল। অল্‌-হাব্বাল্‌ গুন্‌ গুন্‌ করে ইরাকী সুর ভাঁজছে —তার সঙ্গে ভারতীয় সুরের আশ্চর্য মিল। কত বয়স হবে লোকটার? দেখে আন্দাজ করার কোন উপায় নেই। হাসলে পরে চোখের কোনে অসংখ্য কুঁচকোন লাইন দেখা দেয়। তাই দেখে এক এক সময় মনে হয় বয়স নব্বই ও হতে পারে। অথচ কী আশ্চর্য এনার্জি লোকটার ষাট মাইলের উপর গাড়ি চালিয়ে এলো-এখনো ক্লান্তির কোন লক্ষণ নেই।

আরো মিনিট দশেক চলার পর গাড়িটা একটা ঝাউ গাছের পাশে এসে থামল। অল্‌ হাব্বাল্‌ বলল, 'বাকি পথটুকু আমাদের হেঁটে যেতে হবে। বেশি না—সিকি মাইল পথ।'

অদ্ভুত নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশ। গাছপালা রয়েছে অনেক—উইলো, ওক, ঝাউ, খেজুর ইত্যাদি—প্রায় বনই বলা যেতে পারে, অথচ তারই ফাঁকে ফাঁকে এক একটা বিরাট পাথরের ঢিবিও রয়েছে। মাঝে মাঝে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে বুলবুলের ডাকটা শুনে দেশের কথা মনে পড়ে গেল। জায়গায় জায়গায় গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে, আর সে রোদটা গায়ে পড়লে বেশ আরামই লাগছে।

এবার চোখে পড়ল আমাদের সামনেই একটা বেশ বড় পাথরের ঢিপি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে ঢিপিটা, আর তার সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা প্রায় একটা চারতলা বাড়ির সমান।

টিলাটার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় অল্-হাব্বাল্ হঠাৎ থেমে বলল, 'এসে গেছি।'

কোথায় এসে গেছি? বাঁ দিকে ঝাউ বন, আর ডান দিকে টিলার খাড়াই অংশ—এ ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে দেখবার কী থাকতে পারে?

অল্-হাব্বালের দিকে চেয়ে দেখি তার মুখের ভাব একদম বদলে গেছে। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, সারা শরীর কেমন যেন একটা উত্তেজনার ভাব, যার ফলে সে তার হাতদুটোকে স্থির রাখতে পারছে না। হঠাৎ সে তার অদ্ভুত কায়দায় খিল খিল করে হেসে আমাদের তিনজনের উপর তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল—'তোমরা না সব আবিষ্কারক—ইনভেন্টার্স? বিংশ শতাব্দীর সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক? বেশ—তাহলে ছাখো এবার প্রথম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের কারসাজি!—'চিচিং ফাঁক্!'

আমি বাংলায় চিচিং লিখলেও অল্-হাব্বাল্ অবিশ্যি আরবী 'সিম্ সিম্' শব্দটাই ব্যবহার করেছিল, কিন্তু এই শব্দ উচ্চারণের ফলে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা আজকের দিনের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

টিলার গায়ে একটা বিরাট আলগা পাথরের অংশ একটা গম্ভীর ঘড় ঘড় গর্জনের সঙ্গে এক পাশে সরে গিয়ে গহ্বরের ভিতরে যাবার একটা পথ করে দিল। আমরা তিনজন থ হয়ে দাঁড়িয়ে এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটতে দেখলাম।

অল্-হব্বল্ আমাদের এই অবাক বোকা-বনে-যাওয়া ভাবটা কয়েক মুহূর্ত উপভোগ করে নিয়ে, কুর্নিশ করে, তার বাঁ হাতটা থিয়েটারী ভঙ্গীতে গহ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আলিবাবার গুহায় প্রবেশ করতে আজ্ঞা হোক্!' [ক্রমশঃ

যে ট্রাম/ট্রেন থামবে না

অদ্রীশ বর্ধন

ট্রাম বা ট্রেন বার বার থামে বলেই তো সময় নষ্ট হয়। যাত্রীরাও বিরক্ত হন। সেইসঙ্গে ট্রাম-ট্রেনের দুই তৃতীয়য়াংশ শক্তি নষ্ট হয় বারবার থেমে আবার চলার জন্যে। এ সমস্যার কি সুরাহা নেই? আছে। ট্রাম অথবা ট্রেন না থামলেই হল। কিন্তু যাত্রীরা ওঠানামা করবে কি করে? তারও সমাধান আছে।

মনে করা যাক ঃ—

ক আর খ দুটি স্টেশন। দুটি স্থির চাকতি। কিন্তু তাদের ঘিরে আংটির মত প্ল্যাটফর্মদুটি যেন রিভলভিং স্টেজ। অনবরত ঘুরছে। পাশেই ট্রাম অথবা রেল লাইন। একই গতিতে স্টেশন-দুটিকে বেড় দিয়ে ট্রাম অথবা ট্রেন যাচ্ছে—থামছে না। থামবার দরকারও হচ্ছে না। কেননা, ট্রাম বা ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আংটি-প্ল্যাফর্মদুটিও ঘুরছে। সমান গতিতে ঘোরার দরুন মনে হচ্ছে যেন কেউ ঘুরছেনা। যেন ট্রাম স্থির, ট্রেন স্থির, প্ল্যাটফর্ম স্থির। ফলে, চলন্ত গাড়ি থেকে যাত্রীরা অনায়াসে প্ল্যাটফর্মে ওঠানামা করছে।

গাড়ি থেকে নেমে যাত্রীরা এগোবে স্থির চাকতি ক আর খ-য়ের দিকে। কোনো অসুবিধে হবে না। কেননা, ঘুরন্ত চাকার কিনারা যত জোরে ঘোরে, তার মাঝের অংশ তার চাইতে অনেক আস্তে ঘোরে। স্থির চাকতির কাছে ঘুরন্ত আংটি-প্ল্যাটফর্মের গতি প্রায় নেই বললেই চলে। তাই যাত্রীরা টুপকরে ক আর খ-য়ে পা দেবে। সেখান থেকে বাইরে বেরোনো খুব সহজ। ওভারব্রীজ দিয়ে ঘুরন্ত প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গেলেই হল।

আকাশ হ'য়ে

কার্ত্তিক ঘোষ।

ছবুন যেমন অবুঝ, তেমন
দুষ্টু সবাই মানো...
জান্‌লা দিয়ে কি ছ্যাখে রোজ
কেউ কি সে সব জানো ?
ঐ যেখানে মাঘের শেষে
শুধুই জবড় জং···
গাছ-গাছালির গায়ে মাথায়
সবুজ-সবুজ রং !
ঐ খানেতেই ছোট্ট নদী
যেন গলার চিক্...

যেমনি সরু-তেমনি রোদে
করে সে ঝিক মিক্ !
তার ওপরেই হুমড়ি খেয়ে
ঐ যে আকাশ নীল,
মাঠ-নদী আর গাছের সঙ্গে,
ওর যেন খুব মিল।
ছবুন ছ্যাখে আর ভাবে ঐ—
আকাশ হ'য়ে কবে...
অমনি সে-ও মাঠ-নদী-গাছ
সবার বন্ধু হবে ॥